ওহাবী মতবাদ খণ্ডনে ঐশী অবদান

মূল ঃ আল্লামা দাউদ ইবনে সুলায়মান আল-বাগদাদী
অনুবাদ ঃ গাযী সালাহউদ্দীন

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম, নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম।

বর্তমানকালে আহলে সুন্নাতের আদর্শ হতে বিচ্যুত গোমরাহদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সব গোমরাহ লোকেরা হযরত নবী করীম (সঃ)-এর উম্মতদেরকে মুশরিক আখ্যায়িত করছে। তারা বলে যে, এই অনুগ্রহ প্রাপ্ত উম্মতদেরকে তারা হত্যা করবে এবং তাঁদের মালামাল লুঠ করবে। ফলে, তারা অধ-পতিত হয়েছে। মহান আল্লাহতায়ালার সাহায্যে আমার এই নিবন্ধে আমি এ সব গোমরাহ লোকদেরকে ভ্রান্ত প্রমাণ করব এবং তাদের যুক্তিগুলোর গোমরাহী প্রমাণ করব। হয়ত তারা এ বই পড়ে তাদের ভুল বুঝতে পারবে এবং মুক্তি অর্জন করতে সক্ষম হবে। আর আমিও একটা মহান খিদমত করতে পারব।

ওহাবীরা বিশ্বাস করে না যে, কেউ আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর নবীগণ ও সালেহ আউলিয়ার মাধ্যমে (ওয়াসিলায়) শাফাআত প্রার্থনা করতে পারে এবং তাঁদেরকে আল্লাহ যেই অলৌকিক ক্ষমতা দিয়াছেন সেই ক্ষমতাবলে তাঁদের কাছে বিপদমুক্তি কামনা করতে পারে। তারা আরও বিশ্বাস করে না যে, মানুষ নবী-ওয়ালীগণের রওযা শরীফ যিয়ারত করে তাঁদের শাফাআত কামনা করতে পারে, যাতে তার ইচ্ছা আল্লাহ পাক পূরণ করে দেন অথবা তার বিপদ দূর করে দেন (অর্থাৎ ওহাবীদের কাছে এ সব কাজ কুফর—অনুবাদক)। ওহাবীদের মতে, মৃত্যুর পরে মানুষ আর শ্রবণ ও দর্শন করতে পারে না; তারা মাটিতে পরিণত হয়। ওহাবীরা বলে যে, কবর জীবন বলতে কিছুই নেই। পৃথিবীতে কোন জিনিস অর্জনের জন্য জীবিতদের মধ্যস্থতার মত মৃতদেরও যে ওয়াসিলা (মাধ্যম) বানানো যায়, তা ওহাবীরা অবিশ্বাস করে থাকে। তারা এভাবে অস্বীকার করত না, যদি তারা বিশ্বাস করত যে, মৃতজন কবর জীবন নামের একটা জীবনে বর্তমান রয়েছেন এবং তাঁরা জানেন, শোনেন, দেখেন এবং যিয়ারতকারীকে চিনতে পারেন এবং সালাম দানকারীকে প্রত্যুত্তর দেন, আর নিজেদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁরা পুরস্কার অথবা শাস্তির মধ্যে অবস্থান করেন, আর এই পুরস্কার অথবা শাস্তি, রূহ ও দেহের উপর আপতিত হয় এবং তাঁদের জীবদ্দশায় পরিচিত লোকদের কাজ-কর্ম (আমল) সম্পর্কে তাঁদেরকে জানানো হয়, আর তাঁরা আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও নিজেদের মধ্যে শুভ সংবাদ আদান-প্রদান করেন এবং জীবিতদের জন্য দোয়া করেন। যখন তাঁরা জীবিতদের নেক আমল সম্পর্কে অবহিত হন, আর বদ আমল সম্পর্কে অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দোয়া করেন, "হে আল্লাহ্ পাক! আপনি তাদেরকে সৎ কাজ করতে সাহায্য করুন। আপনি তাদেরকে মুক্তি অর্জন করতে সহায়তা করুন, যেভাবে আপনি আমাদেরকে সহায়তা করেছেন।" যেহেতু মৃত্যু হচ্ছে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে স্থানান্তর, সেহেতু কুরআন, হাদীস এবং ইজমা আল-উম্মাত এ সব তথ্য শিক্ষা দেয়। যে ব্যক্তি এগুলোতে বিশ্বাস করবে না, সে বিশ্বাস স্থাপনের ওয়াজিব বিষয়গুলোতে অবিশ্বাস করে বিদ্আতীতে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

রূপান্তরিত হবে এবং রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সুন্নত থেকে বিচ্যুত হবে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ ধরনের একজন ব্যক্তিকে ভ্রান্ত বিবেচনা করা যায়, কারণ পুনরুত্থান দিবসে মানুষগণ তাঁদের কবর থেকে জীবিতাবস্থায় উঠে আসবেন—এটা ঈমানের ছয়টি মূলনীতির একটি। যে ব্যক্তি এতে অবিশ্বাস করবে, সে কাফিরে পরিণত হবে। মৃতজন কবরে জীবিত এবং তাঁরা শাস্তি অথবা শান্তি ভোগ করবার বিষয়টি, যার উপর ইজমা-এ উম্মত এ মুহাম্মদীয়া হয়েছে, তাতে অবিশ্বাস ক্ষুদ্র পুনরুত্থানে অবিশ্বাসেরই নামান্তর, যেই ক্ষুদ্র পুনরুত্থান রোজ হাশরেরই একটা উদাহরণ মাত্র।

ওহাবীরা বলে, "কবরে দেহ পঁচে যায় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অদৃশ্য হয়ে যায়। তারা আর তখন শুনতে অথবা দেখতে পায় না। দেহের জন্য কোন শাস্তি কিংবা পুরস্কার নেই।"

আমরা তাদেরকে বলি, "তোমরাও তো বিশ্বাস কর যে, রূহ মৃত্যুবরণ করে না। অতএব তোমাদের এও বিশ্বাস করা উচিত যে, উহা অনুভব করে, দেখে এবং শুনে। তাই তোমাদের উচিত নয় সেই সকল মুসলিম-দেরকে বাধা দেয়া, যাঁরা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় রূহসমূহের মধ্যস্থতার উপর বিশ্বাস রেখে শাফাআত ও সাহায্যের আকাঙ্ক্ষী হন। যেহেতু সকল ধর্ম'ই প্রচার করে যে, মৃত্যুর পরও রূহসমূহের অস্তিত্ব থাকে, সেহেতু আল্লাহ্‌র সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় জীবিত রূহসমূহের মধ্যস্থতাকে তোমাদের অস্বীকার করা উচিত নয়, যেমনিভাবে তোমরা বিশ্বাস কর জীবিত মানুষের মধ্যস্থতাকে।" খোলা মন নিয়ে এ বিষয়ের উপর চিন্তা করার অক্ষমতার দরুন ওহাবীরা বলে "মৃতজনের কাছ থেকে কোন সাহায্যই আশা করা যায় না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় বান্দাদের রূহ থেকে শাফাআত ও সাহায্য আশা করে, সে কাফির এবং মুশরিকে পরিণত হয়।" অত্যন্ত পরি-তাপের সঙ্গে পরিদৃষ্ট হচ্ছে যে, বর্তমানকালে বহু মানুষ এমন কি ওহাবীদের দ্বারা ধোঁকাপ্রাপ্ত ধর্মীয় পদে সমাসীন ব্যক্তিবর্গও আহলে সুন্নতের ঐ সকল গোমরাহ শত্রুদের গুণকীর্তন করছে এবং তাদের ভ্রান্ত ও বিষাক্ত বই পত্র অনুবাদ করে যুব সম্প্রদায়কে প্রতারিত করতে সচেষ্ট হচ্ছে। প্রত্যেকেই জানেন যে, সৌদি আরবীয় সরকার ওহাবীবাদ সারা বিশ্বে প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে চলেছে এবং একটা দপ্তর স্থাপন করেছে এই কাজ চালিয়ে যাবার জন্য। কিছু বুদ্ধিহীন মানুষ তাদের দীনকে বিক্রি করে ওহাবীদের মতাদর্শে দীক্ষা নিয়ে শুধুমাত্র পয়সার জন্য যুব সম্প্রদায়কে বিপথে পরিচালিত করছে। এ ধরনের নীচু জাতের বুদ্ধিবিবর্জিত মানুষ প্রত্যেক জাতিতেই রয়েছে। আর বহু লোক আছে যারা ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে ওহাবীদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে এবং তাদের মতাদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছে, আর ইসলামের মধ্যে সংস্কার সাধনে তৎপর হয়েছে। এ সকল অজ্ঞ লোকেরা যারা নিজেদেরকে আলেম হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে, তারা আয়াত এবং হাদীসও চিনে না। তারা সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীনের বাণী সম্পর্কেও জ্ঞানহীন। তারা মাত্রাতিরিক্ত অজ্ঞ। কিছু আরবী শিখেই নিজেদেরকে জ্ঞানী মনে করে থাকে তারা। জ্ঞান অর্জন করে আলেম হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাদের মধ্যে নেই। সৌদি আরব থেকে প্রাপ্ত স্বর্ণ দ্বারা ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়েছে এ সকল লোকেরা। দীন ও দুনিয়া সম্পর্কে তারা অচেতন। হতভাগ্য যুবকেরা তাদেরকে ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে গণ্য করে থাকে। এ সকল লোকেরাই ইসলামের ধ্বংসকারী। তথা-কথিত এ সকল 'আলেম' মুসলিমদের নেতা হয়ে বসছে। তারা রাজনৈতিক আসন দখল করতে সমর্থ হচ্ছে। তাদের উর্বর মস্তিষ্কসঞ্জাত কল্পনা সমূহকে তারা ধর্মীয় শিক্ষা হিসেবে পেশ করে থাকে। আর নিজেদের মত অন্যদেরকেও বিচ্যুত করে সঠিক পথ হতে। সহীহ্ বুখারী শরীফে লিখিত

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

হাদীসটি এদের আগমনী বার্তা দিয়েছে বহু আগেই। এই ক্ষতিকর বিচ্যুতি সম্পর্কে ওয়াকেফহাল প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত মানুষকে জাগ্রত করা। যদি এই ধারাকে বাধা না দেওয়া হয়, তবে এটা প্রাক-ইসলামী পর্যায়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে মুসলিমদেরকে। কারণ কবর আযাবে অবিশ্বাস শেষ বিচারের দিনের উপর অবিশ্বাসের জন্ম দিবে।

কবরের আযাব কিংবা শান্তি, রূহ্ এবং দেহ উভয়ের উপরই প্রয়োগ করা হয়। এ বিষয়টির উপর বিশ্বাস স্থাপন একান্ত অপরিহার্য। ইমাম মুহাম্মদ শায়বানী (রহঃ) তাঁর আল-আকাইদ, আশ-শায়বানীয়া নামের পদ্যে এটা ব্যক্ত করেন—"কবরে আযাব আছে সেটা রূহ এবং দেহ উভয়েই উপরই আপতিত," অর্থাৎ, দেহ এবং আত্মা উভয়ই পুরস্কার কিংবা শান্তি ভোগ করবে কবর জীবনে। যদিও জীবিত মানুষেরা তা দেখে না, তবুও এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা তাদের জন্য জরুরী। এ গুপ্ত বিষয়টিতে বিশ্বাস করা অপরিহার্য। এতে অবিশ্বাস, বা আস্ কবর থেকে পুনরুত্থানে অবিশ্বাসের জন্ম দিবে। অথচ, দুটোই আল্লাহ্ তায়ালার ক্ষমতাবলে সংঘটিত হবে। যে ব্যক্তি পরবর্তী বিষয়টিতে বিশ্বাস করে, তার জন্য পূর্ববর্তীটিতে বিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত। যদিও জীবদ্দশায় মানুষেরা কবর আযাব সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে না, তবুও আয়াত ও হাদীস-সমূহ এবং এ উম্মাহর সালেহ উত্তরসূরীগণ ব্যক্ত করেন যে, কবর আযাব রয়েছে। আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং হাদীসসমূহ পেশ করে দেখাব যে, আল্লাহ্ পাকের কবরস্থ প্রিয় বান্দা-দেরকে ওয়াসিলা করে তাঁদের শাফাআত কামনা করা জায়েয (অনুমতি প্রাপ্ত), যাতে ব্যক্তির কাম্য বস্তু আল্লাহ্ সৃষ্টি করে দেন। এ সব দলিল পর্যা-লোচনা করলে দেখা যাবে যে, মৃতজন নিজেদের ক্ষমতাবলে কিছুই করতে পারেন না এবং তাঁদের থেকে প্রার্থনার আক্ষরিক অর্থে কোন কিছুই চাওয়া হয় না, যা ওহাবীরা রটিয়ে বেড়ায়, জীবিত লোক-দেরকে চলাফেরা এবং কাজ করতে (তাসাররুফ) দেখে ওহাবীরা মনে করে যে, তাদের কাছে সাহায্য ও সুপারিশ প্রার্থনাকারী বুঝি তাদের কাছেই আবেদন করে থাকে। অথচ, জীবিতদের কাছে প্রার্থনা করা আর কিছুই নয়, শুধু তাদেরকে আল্লাহ-তায়ালার সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতাকারী বানানো ছাড়া। একমাত্র আল্লাহ্ই সকল বস্তু সৃজন করে থাকেন এবং সব কিছু পরিচালনা (তাদ্বির) করে থাকেন। জীবিত ও মৃত সকলেই তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় ওয়াসিতা বা বাহন স্বরূপ। তিনি নিজেই এ ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন যে, সৃষ্টিজগত তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় মাধ্যম বা বাহন হবে। আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা এই যে, বহু জিনিসের মধ্যস্থতায় তিনি সৃষ্টি করবেন, যাতে পৃথিবী নিয়মানুযায়ী পরি-চালিত হতে পারে। তবুও বহু জিনিস তিনি মধ্য-স্থতা ব্যতিরেকে সৃজন করে থাকেন।

নবীগণ (আঃ) এবং আউলিয়া (রহঃ) তাঁদের মুবারক কবর সমূহে কবর জীবন নামের একটা জীবনে বর্তমান রয়েছেন, যা আমরা জানি না। তাঁরা নিজ হতে কিছুই করতে পারেন না। আল্লাহ্ পাকই তাঁদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্ষমতা ও মর্যাদা দিয়েছেন মধ্যস্থতাকারী হবার জন্য। যেহেতু তিনি তাঁদেরকে ভালবাসেন, সেহেতু তিনি তাঁদেরকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করে তাঁর স্বাভাবিক রীতি-বহির্ভূত সুবিধাদি প্রদান করে থাকেন। তাঁদের উসিলায় মহান আল্লাহ্ পাক মনোবাসনা পূর্ণ করে দেন। এই হাজত মকসুদ (মনোবাসনা) পূরণের উদ্দেশ্যেই তাঁদেরকে মধ্যস্থতাকারী হবার জন্য অনুরোধ করা হয়। ওহাবীদের এটা একটা বানোয়াট কাহিনী যে, আহলে সুন্নাত কবর পূজা করে মুশরিকে রূপান্তরিত হয়েছে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে এটা জঘন্য কুৎসা রটনা বৈ কিছু নয়। কিছু অজ্ঞ লোক অথবা অধার্মিক লোক নির্দোষ গ্রামবাসীদেরকে

ধোঁকা দিয়ে দুনিয়াবী স্বার্থসিদ্ধির জন্য শরীয়তের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ কাজ-কারবারে লিপ্ত হতে পারে, আর এটা নিশ্চিত যে, ইসলামী জ্ঞান ও মূল্যবোধ যে দেশে বিস্মৃত হয়েছে, সেই দেশে এ সব বিভ্রান্তরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। তাদের ছুতা দেখিয়ে ওহাবী মতবাদকে আত্মরক্ষা না করে ঐ সব বিচ্যুতিকে সংশোধন করার চেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া বেশী জরুরী। নেতিবাচক মনোভাবের পরিবর্তে ইতি-বাচক মনোভাব গ্রহণ করা উচিত। মুসলিমদের মধ্যে আবার কিছু লোক আছে যারা কবর জীবন এবং তার পুরস্কার অথবা শাস্তিতে বিশ্বাস করে, কিন্তু ওফাতের পর আল্লাহ্‌র সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় নবী-ওয়ালীগণের মধ্যস্থতাতে বিশ্বাস করে না। আর কিছু লোক বলে, "আল্লাহ পাকের সৃষ্টি ক্ষমতাকে বিবেচনা না করে কেন শুধুমাত্র মৃতজনদের কাছে প্রার্থনা করা হয়? তাঁদের শাফা আত প্রার্থনা এবং তাঁদের মাধ্যমে হাজত মকসুদ পূরণ শরীয়তে বিবৃত হয় নি।" এ কথা যারা বলে তারা কবর জীবনে অবিশ্বাসী ওহাবীদের মত ক্ষতিকর নয়। তারা কুরআন-হাদীস না জেনেই ঐ ধরনের কথা বলে অথবা তারা নিছক একগুঁয়েমির খাতিরেই ঐ রকম আচরণ করে। মুসলিমদের উচিত একগুঁয়ে না হয়ে সঠিক কথাকে স্বীকার করে নেয়া। আমি আমার উত্তরকে আটটি অধ্যায়ে পেশ করব।

প্রথম অধ্যায়ঃ নবীগণ (আঃ) তাঁদের কবর শরীফে জীবিতাবস্থায় রয়েছেন। তাঁরা রূপকার্থে (মাজাযী) জীবিত নন, বরং বাস্তব ক্ষেত্রেই জীবিত। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "আল্লাহর সাথে শহীদ-দেরকে কখনো মৃত মনে করবে না। তারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে জীবিত। তারা রিযিকপ্রাপ্ত (সূরা আল-ই ইমরান, ১৬৯ আয়াত)। এই আয়াতটি ব্যক্ত করে যে, শহীদগণ অন্যান্য মুসলিমদের মতই মর্যাদাসম্পন্ন এবং অন্যান্যদের উপরে তাঁদের মর্যাদা নেই। কিন্তু নবীগণ শহীদগণ অপেক্ষা উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন। ইসলামী উলামা বলেছেন যে, প্রত্যেক নবী (আঃ)-ই শহীদ হিসাবে ইন্তেকাল করেছেন। এ বিষয়টি প্রত্যে-কেই জানেন ভালভাবে। যদিও আল-হালাবী তাঁর পুস্তক সিয়্যার এ লিখেছেন, "উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তির চাইতে নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তির হয়ত একটা মাহাত্ম্য (কিংবা গুণ) বেশী থাকতে পারে, তবুও এ কথাটা এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। কারণ এ কথাটা এমন একটা মাহাত্ম্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেটা কোন আয়াত কিংবা হাদীসে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়নি। কিন্তু যেহেতু হাদীসসমূহে ঘোষিত হয়েছে যে নবীগণ শহীদ সেহেতু এই বিষয়ে আল-হালাবীর কথা প্রযোজ্য নয়। আল-বুখারী এবং আল-মুসলিম বর্ণিত একটা হাদীস ঘোষণা করে:

مررت ليلة اسرى بى على موسى و هو قائم فى قبره يصلى -

অর্থাৎ, "মিরাজ রজনীতে আমি মূসা (আঃ)-এর কবরের পাশ দিয়ে গমন করি। তিনি তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন" (হাদীস)। আল বায়হাকী এবং আরো বহু রেওয়ায়াতকারী বর্ণিত। একটা হাদীস ইরশাদ ফরমায়:

عن انس رضى الله تعالى عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال الا نبياء احياء فى قبور هم يصلون -

অর্থাৎ, "নবীগণ তাঁদের কবর শরীফে জীবিত তাঁরা সালাত আদায় করেন (হাদীস)।" আরেকটা হাদীস ঘোষণা করে:

ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الا نبياء -

অর্থাৎ, "আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীদের (দেহ মুবারক)-কে মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন" (হাদীস)। এ বিষয়টি ইজমা-উলামা-এ উম্মাত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আল-বুখারী ও আল-মুসলিমের সহি-হাইনে লিপিবদ্ধ আছে: আল্লাহ পাক মিরাজ রজ-নীতে সকল নবী (আঃ)-কে আমাদের নবী (সঃ)-এর কাছে প্রেরণ করেন। নবীজী (সঃ) ইমাম হন এবং

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তাঁরা সকলে দুই রাকআত নামায পড়েন"। রুকু এবং সিজদা সালাতের অন্তর্ভুক্ত। তাই এতে প্রতিভাত হয় যে, তারা স্বশরীরে নামায পড়েছিলেন। কবর মুবারকে হযরত মূসা (আঃ)-এর নামায পড়াও এ বিষয়কে প্রমাণ করে। মিশকাত শরীফে লিপিবদ্ধ এবং আল-বুখারী ও আল-মুসলিমে রেওয়াতকৃত একটা হাদীস ইরশাদ করে :

وقدرا يتنى فى جماعة من الا نبياء فاذا مو سى قائم
يصلى فذا هورجل ضرب جعد يعنى شعده غير سبط
كانه من رجل شنوٗ ة و هم قو م من الز ط سمر اللو ن

অর্থাৎ "আমি নবীদের সমাবেশে ছিলাম। হযরত মূসা (আঃ) দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। তিনি কালো ছিলেন। তাঁর চুল ময়লা অথবা এলোমেলো ছিল না। বরং তাঁকে দেখতে লাগছিল 'যাত' গোত্রের একজন সাহসী যুবকের মত" (হাদীস)। এ সকল হাদীস। প্রতীয়মান করে যে, নবীগণ আল্লাহ্-তায়ালার হুযুরে (উপস্থিতিতে) জীবিত। তাঁদের রূহের মত তাঁদের দেহও অশরীরী হয়ে গিয়েছে। তাঁদের দেহ মুবারক ঘনও নয়, আবার শক্তও নয়। তাঁরা পার্থিব কিংবা অপার্থিব উভয় জগতেই দৃশ্যমান হতে পারেন। এ কারণেই নবী (আঃ)-দেরকে রূহ এবং স্বশরীরে দেখা যায়। হাদীসটি ঘোষণা করে যে মূসা (আঃ) নামায পড়ছিলেন; সালাত শারীরিক ক্রিয়াকলাপেই মাধ্যমেই সংঘটিত হয়ে থাকে, রূহানী ভাবে নয়। রসূল-এ করীম (সঃ) কর্তৃক প্রদত্ত হযরত মূসা (আঃ)-এর শারীরিক বিবরণ পরিস্ফুট করে যে, তিনি মূসা (আঃ)-কে রূহানীভাবে নয়, বরং শরীর সমেত দেখেছিলেন। অন্যান্য মানুষের মত নবী (আঃ)-গণ মৃত্যু বরণ করেন না। তাঁরা নিজেদেরকে এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী থেকে চিরস্থায়ী জগতে স্থানান্তরিত করেন। ইমাম আল-বায়হাকী তাঁর 'ইতিকাদ' গ্রন্থে লিখেছেন, "কবরে রাখার পর নবীদের তাঁদের রূহ মুবারক ফিরিয়ে দেয়া হয়। আমরা তাদেরকে দেখতে পাই না। তাঁরা ফেরেশতাদের মত অদৃশ্য হয়ে যান। আল্লাহ্ পাক যে সকল মনোনীত লোককে কারামত স্বরূপ দর্শন ক্ষমতা দান করেছেন, শুধুমাত্র তারাই নবী (আঃ) দেরকে দেখতে পান।" ইমাম সুয়ুতীও তাই বলেছেন। ইমাম নববী, আস্ সুবকী ও আল-কুরতুবী তাঁদের গুরুজনদের কাছ থেকে একই কথা রেওয়াত করেছেন। হাম্বলী মযহাবের ইবনুল কাইয়েম আল-জাওযিয়া তাঁর 'কিতাবুর রূহ' পুস্তকে হুবহু তাই লিখেছেন। শাফেয়ী উলামা-এ-কিরাম হযরত ইবনে হাজর আল-হায়তামী, খায়রুদ্দিন আর রামলী, কাযী যাকারিয়া এবং হানাফী উলামা-এ কিরাম ইবনে আবি হামযা, ইবনুল হাজ্জ তাঁর 'মাদখাল' গ্রন্থে এবং শায়খ ইব্রাহীম লাকানী তাঁর 'জাওহারাতুত্ তাওহীদ' কিতাবে এবং আরও বহু উলামা একই কথা বর্ণনা করেছেন। সাইয়েদ ইবনে মুসাইয়াব বলেন, "হুজরাহ আন-নাবাওয়ীয়্যাতে আযান ও ইকামত তিলাওয়াত করতে শোনা গিয়েছিল তখন, যখন মসজিদ আন্ নবীতে আযান দেয়া যায় নি এবং সালাত পড়াযায় নি।" এটা ঘটে ৬১ হিজরীতে সংঘটিত সেই হাররা ঘটনায় যেই ঘটনাবহুল দিবসে ইয়াযিদ মদীনাবাসীদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল। ইবনে তাইমিয়াও তাঁর 'ইতিকাদ' উস্ সিরাতিল মুস্তাকিম' পুস্তকে এ ঘটনাটি উদ্ধৃত করেন। বহু লোক কবর আস্ সায়াদা' এর ভিতর থেকে তাঁদের সালামের প্রত্যুত্তর শুনেছেন। অন্যান্য কবর থেকেও বহুবার সালামের প্রত্যুত্তর শোনা গিয়েছে। আমরা এ ব্যাপারে পরে আলোচনা করব। উলমা-এ ইসলামের ঐকমত্য অনুসারে বোঝা গিয়েছে যে, নবীগণ তাঁদের কবর শরীফে জীবিতাবস্থায় রয়েছেন। একটা সহীহ্ হাদীসে ঘোষিত হয়েছে :

ما من احد يسلم على الا رد الله على روحى حتى
ارد عليه السلام -

অর্থাৎ "যখন কোন ব্যক্তি আমাকে সালাম দেয়,

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তখন আল্লাহ আমার রূহকে আমার দেহে ফিরিয়ে দেন এবং আমি সালাম দানকারীর সালামের উত্তর দিই" (হাদীস)। এ কথা বলা যাবে না যে, এই হাদীসটি উপরোল্লিখিত বিষয়ের সঙ্গে মতভেদ সৃষ্টি করেছে অর্থাৎ কেউ বলতে পারবে না যে, হুযুর (সঃ)-এর রূহ্ মুবারক তাঁর দেহ মুবারককে ত্যাগ করেছিল, আর সালাম দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। যারা ঐ রকম কথা বলেছে, তাদেরকে যথোচিত উত্তর দিয়েছেন উলামা এ ইসলাম। ইমাম জালালুদ্দিন আস সুয়ূতী এ ধরনের সতেরোটি ব্যাখ্যামূলক উত্তরকে লিপিবদ্ধ করেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরতম উত্তর হচ্ছে এই যে, হুযুর পাক (সঃ) আল্লাহ্‌র জামাল দেখার ফলে আনন্দে আত্মহারা অবস্থায় আছেন এবং তার দৈহিক চেতনা লুপ্ত হয়েছে; যখন কোন মুসলিম তাঁকে সালাম দেন, তখন তাঁর রূহ মুবারক এই অবস্থা থেকে জাগ্রত হন আর দৈহিক চেতনা ফিরে পান। এ পৃথিবীতেও ঐ ধরনের অবস্থা কম নয়। দুনিয়াবী কিংবা অপার্থিব বিষয়সমূহকে চিন্তামগ্ন ব্যক্তি মানুষের কথাবার্তা শুনতে পায় না। তাহলে যিনি জামাল-আল্লাহ্ দর্শনে আত্মহারা তিনি কিভাবে শব্দ শুনবেন ?

ঘুমে কিংবা জাগ্রতাবস্থায় কি কেউ নবীজী (সঃ)-কে দেখতে পারে ? যদি তাঁকে দেখা যায় তবে সেটা কি তিনি ? নাকি তাঁরই অনুরূপ কোন দৃশ্য ? উলামাগণ এ প্রশ্নের উত্তর বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। হুযুর (সঃ)-এর কবর শরীফে জীবিত থাকার উপর ইজমা (ঐকমত্য) ছাড়াও অধিকাংশ উলামা বলেছেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে হুযুর (সঃ)-কেই দেখা যায়। হাদীস-সমূহ থেকেও তা বোঝা যায়। একটি হাদীস ঘোষণা করে :

من رآني في المنام فسيراني في اليقظة -

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে যেন জাগ্রতাবস্থায়ই আমাকে দেখল (হাদীস)।" এ কারণেই ইমাম নব্বী বলেন, "স্বপ্নে তাঁকে দেখা যেন বাস্তবেই তার দর্শন লাভ।" বস্তুতঃ ইমাম মানাওয়ী তাঁর 'কানয আদ্ দাকাইক' গ্রন্থে একটা হাদীস রেওয়ায়াত করেন, যেটা ঘোষণা করে :

من رآني في المنام فقد رآني حقا فان الشيطان لا يتمثل بي -

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আমাকে সপ্নে দেখবে, সে বাস্তবিকই আমাকে দেখবে, কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করিতে পারে না (হাদীস)।" যদি আমরা তাঁর অনুরূপ কিছু দেখে থাকি আমাদের স্বপ্নে, তাহলে তো আর আমরা তাকে বাস্তবিকই দেখব না। ইব্রাহীম লাকানী তার জওহরাতুততাওহীদ' গ্রন্থে লিখেছেন, "হাদীস উলামা সর্বসম্মতভাবে জানিয়েছেন যে রসূল আকরাম (সঃ)-কে জাগ্রত কিংবা স্বপ্নে উভয় অবস্থাতেই দেখা যেতে পারে।" তবে হুযুর নূর (সঃ)-কে দেখা গেল, নাকি তাঁর মত দেখতে অন্য কাউকে দেখা গেল, তা নিয়ে মতভেদ আছে; এর উপর সর্বসম্মত হয় নি। ইমাম আল-গাজ্জালী ও ইমাম আল কুরাফী এবং আরও কয়েকজন উলামা বলেছেন যে, তাঁর অনুরূপ অন্য কাউকে দেখা যায়। আর যাঁরা বলেছেন যে, হুযুর (সঃ)-কেই দেখা যায় তাঁরাই হচ্ছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ত্রিশের অধিক হাদীস ইমাম এবং মহান উলামা। আমি তাঁদের প্রত্যেকের প্রামাণ্য দলিল একটা আলাদা পুস্তকে ব্যাখ্যা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : মৃতজনের শ্রবণ ও দর্শন ক্ষমতা প্রসঙ্গে কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে যে, শহীদগণ তাঁদের কবরে জীবিতাবস্থায় রয়েছেন। আর আউলিয়ায়ে কিরাম আল্লাহ্ পাকের কারামতরূপে নিয়ামতের মাধ্যমে শ্রবণ ও দর্শন করে থাকেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদের ওয়াস্তে তাঁর স্বাভাবিক রীতি-নীতি বহির্ভূত পদ্ধতিতে সৃষ্টি করে থাকেন। যে সব অজ্ঞ লোকেরা বিশ্বাস করে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

না যে, নবীগণ বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হযরত রসূলে করীম (সঃ) এবং আউলিয়ায়ে কিরাম ও শহীদগণ তাঁদের কবর শরীফে শ্রবণ এবং দর্শন করতে পান, তাদেরকে স্তব্ধ করে দিবার জন্য আমি সর্বপ্রথমে ব্যাখ্যা করব যে, এমন কি মৃত কাফিররাও শুনতে ও দেখতে পায়! আল-বুখারী রেওয়ায়াত-কৃত একটা হাদীস ঘোষণা করে ঃ

ان لميت اذا دفن و تولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعال المشيعين له اذا انصرفوا عنه -

অর্থাৎ "দাফনের পরে মৃতরা প্রস্থানকারী লোকদের পায়ের শব্দ শোনতে পায় (হাদীস)।" আল-বুখারী ও আল-মুসলিম শরীফে লিপিবদ্ধ একটা হাদীস বর্ণনা করে যে, বদরের জিহাদে নিহত লোকদের লাশগুলোকে যুদ্ধের কিছু দিন পরে একটা গর্তে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এর কিছু দিন পরে হুযুর পাক (সঃ) সেখানে গমন করে প্রত্যেক কাফিরের নাম তার পিতার নামসহ উচ্চারণ করে বলেন, "তোমাদের রবের ওয়াদাকৃত বস্তু কি তোমরা অর্জন করতে পেরেছ? আমি তো আমার রবের ওয়াদাকৃত বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি।" এ কথা শুনে হযরত উমর (রাঃ) হুযুর (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, "ইয়া নবী আল্লাহ্! আপনি কি এ সব লোকদেরকে বলছেন, যারা লাশে রূপান্তরিত হয়েছে?" আর নবীজী (সঃ) উত্তর দেন ঃ "আমি আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের নামে বলছি, যিনি আমাকে সত্য নবীস্বরূপ প্রেরণ করেছেন যে, তুমিও আমাকে তাঁদের মত এত ভালভাবে শ্রবণ করতে পার না। কিন্তু তারা উত্তর প্রদানে অক্ষম (হাদীস)।"[১]

আল-বুখারী ও আল-মুসলিম বর্ণিত আরেকটি হাদীস ঘোষণা করে ঃ

ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه -

অর্থাৎ "মৃত ব্যক্তি তার আত্মীয়বর্গের উচ্চ স্বরে ক্রন্দনের জন্য শাস্তি পায় (হাদীস)।" ইমাম নববী সহীহ্ মুসলিম শরীফের শরহে বলেন, "মৃত ব্যক্তি তার আত্মীয়-পরিজনের উচ্চস্বরে ক্রন্দন দ্বারা আযাবপ্রাপ্ত হয়।" মুহাম্মদ ইবনে জারির তাবারীও একই কথা বলেছেন। কাযী আয়ায বলেন যে, এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা এবং উল্লেখ করেন যে, হুযুর নূর (সঃ) একজন মহিলাকে তার মৃত পুত্রের জন্য উচ্চস্বরে কাঁদতে বারণ করেছিলেন। রসূলে মকবুল (সঃ) আদেশ দেন ঃ

فيا عباد الله لا تعذبوا اخوا لكم -

অর্থাৎ, "ওহে মুসলিমরা! তোমরা কবরে শায়িত তোমাদের ভ্রাতাদেরকে উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করে শাস্তিযোগ্য করো না (হাদীস)।" হাদীসটি প্রতীয়মান করে যে, মৃতজন শ্রবণ করেন এবং আত্মীয়দের কান্নায় আযাব অনুভব করেন। হুযুর (সঃ) ইরশাদ ফরমান, 'কবরের মৃতজনদের সম্ভাষণ জানানোর সময় সালাম দিবে (হাদীস)।" এ কারণেই মুসলিমগণ বলেন, "আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহ্‌লা দারীল কওম-ইল মু'মিনীন।" নিশ্চয়ই এ ধরনের সম্ভাষণ একমাত্র শ্রবণ ও উপলব্ধি ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকেই দেয়া যায়। যদি তাঁরা না শুনতেন, তাহলে সালাম জানানো হতো অস্তিত্বহীনতাকে কিংবা পাথরকে। সালেকগণ অর্থাৎ মহান উলামায়ে ইসলাম সর্বসম্মত-ভাবে বলেছেন যে, মৃতজনকে এভাবেই সম্ভাষণ দিতে হবে।

(ক্রমশঃ)

---

(১) هل وجدتم ما وعد كم ربكم حقا فا نى وجدت ماوعد نى ربى حقا فقال له عمر رضى الله عنه يا رسول الله ما تخاطب من اقوام قد جيفوا فقال والذى بعثنى بالحق ماانتم با سمع منهم ولكنهم لا يستطيعون جوابا -

ওহাবী মতবাদ খণ্ডনে ঐশী অবদান

মূল ঃ আল্লামা দাউদ ইবনে সুলায়মান আল-বাগদাদী
অনুবাদ ঃ গাযী সালাহ্ উদ্দীন

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

তৃতীয় অধ্যায় ঃ মৃতজন যিয়ারতকারীদেরকে চিনতে পারেন। 'কিতাবুল কুবুর' গ্রন্থে' আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে আবিদ দুনইয়া লিখেছেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) নবী করীম (সঃ)-এর কথা রেওয়ায়েত করেন :

عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يزور قبر اخيه و يجلس عنده الا استأنس به و رد عليه حتى يقوم -

অর্থাৎ 'যখন কোন মুসলিম তার অপর কোন মুসলিম ভ্রাতার কবর যিয়ারত করে কবরের পাশে বসে, তখন মৃত মুসলিমটি তাকে (যিয়ারতকারীকে চিনতে পারে এবং তার সালামের প্রত্যুত্তর দেয়' (হাদীস)। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীস ঘোষণা করে ঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال اذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه واذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام -

অর্থাৎ, 'যদি কেউ তার কোন পরিচিত লোকের কবর যিয়ারত করে সালাম দেয়, তবে মৃত ব্যক্তি তাকে চিনতে পারে এবং সালামের প্রত্যুত্তর দেয়। আর যদি সে অপরিচিত কোন মৃত মুসলিমকে সালাম দেয় তাহলে মৃত ব্যক্তি আনন্দিত হয় এবং সালামের প্রত্যুত্তর দেয়' (হাদীস)।" (ইবনে আবিদ দুনইয়া কৃত 'কিতাবুল কুবুর' গ্রন্থের উদ্ধৃতি এখানে শেষ হলো)। ইউসুফ ইবনে আবদুল বার এবং 'আহকাম' গ্রন্থের লেখক আবদুল হক বলেছেন যে, হাদীসটি সহীহ। ইবনুল কাইয়েম আল জাওযিয়া তাঁর কৃত 'কিতাবুর রূহ' গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃত করে বহু খবর দেয় আর জানায় যে এ বিষয়ে আরও বহু হাদীস আছে। হাদীসটিতে ব্যবহৃত 'যিয়ারত' শব্দটি ব্যবহার করা হতো না, যদি মৃতজন যিয়ারতকারীকে চিনতে না পারতেন। সকল ভাষায় এবং সকল অভিধানে এই শব্দটিকে পরিচিত মানুষ-দের মধ্যে পরস্পরের সাক্ষাতকার হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, সাক্ষাতকারিগণ একে অপরকে বুঝতে সক্ষম। আর 'সালামুন আলাইকুম' শব্দটি তো সেই ব্যক্তিকেই বলা যায়, যিনি তা বুঝতে পারেন। যদি কোন ব্যক্তি কবরের কাছে সালাত আদায় করেন, তা হলে মৃতজন তা বুঝতে পারেন এবং তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। ইয়াযিদ ইবনে হারুন বর্ণনা করেন, "ইবনে সাসাব একটা দাফন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তাঁর পরনে হালকা বস্ত্র ছিল। একটা কবরের কাছে তিনি দু'রাকআত (নফল) নামায পড়েন। এরপর তিনি কবরটির উপর হেলান দিয়ে দাঁড়ান। তিনি আল্লাহ্ পাকের নামে শপথ করে বলেন যে, তিনি জাগ্রতাবস্থায় কবরটির ভিতর থেকে একটা কণ্ঠস্বরকে বলতে শোনেন, 'আমাকে ব্যথা দিবেন না। আপনি ইবাদত করেন কিন্তু শুনতে পান না। আপনি জানেনও না। আমরা জানি কিন্তু নড়তে চড়তে পারি না। আমার দৃষ্টিতে আপনার আদায়কৃত ঐ দুই রাকআত সালাতের মত মূল্যবান জিনিস আর নেই।' কবরে শায়িত মৃতজন

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইবনে সাসাব নামায পড়েছিলেন এবং কবরের উপর হেলান দিয়েছিলেন।" উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর ইবনুল কাইয়েম আল জাওযিয়া সাহাবায়ে কিরামের কাছ থেকে বর্ণিত আরও অনেক ঘটনার বর্ণনা দেন, যেগুলোতে প্রমাণিত হয় যে, মৃতজন শ্রবণ করিতে সক্ষম। ওহাবীরা ইবনুল কাইয়েম আল জাওযিয়াকে একজন মুজতাহিদ মনে করে থাকে, তার উপরোক্ত লেখনীতে বিশ্বাস করে না এবং আরও দাবী করে যে, এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীরা মুশরিক। ওহাবীদের এই ধরনের আচরণ থেকে পরিস্ফুট হয় যে, তারা উলামায়ে ইসলামকে শ্রদ্ধা করে না, কিন্তু তাদের স্বার্থের সঙ্গে খাপ খেলে তারা তাঁদের প্রশংসা করে থাকে। আরও প্রতিভাত হয় যে, তারা ইসলামী উলামাকে পছন্দ করে না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন যে, বদরের জিহাদে নিহত কাফিররা, যাদেরকে একটা গর্তে রেখে দেয়া হয়েছিল, তারা শুনতে পায়নি। এ কারণেই কিছু লোক মনে করেছিল যে মৃতজন, এমনকি মুমিনগণও কবরে শুনতে পান না। আর কিছু অজ্ঞ লোক বলেছিল যে, শহীদগণ এমন কি হুযুর পুর নূর (সঃ)-ও শুনতে পান না। যারা মনে করেছিল যে, মৃতজন শুনতে পান না, তারা ভুল করেছিল কারণ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছিলেন যে, গর্তে সমাহিত কাফিররাই শুধু শ্রবণ করতে অক্ষম। তারা মনে করেছিল যে, এই শ্রবণ বুঝি সেই অর্থে, যেভাবে সূরা আল ফাতির-এর ২২ নং আয়াতে ঘোষিত হয়েছে :

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ -

অর্থাৎ "আপনি মৃতদের শোনাতে পারবেন না। আপনি তাদেরকে শোনাতে পারবেন না, যারা কবরসমূহে আছে" (আয়াত)। অথচ, এটা সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; 'শ্রবণ' শব্দটিকে মহান উলামা ব্যাখ্যা করেছেন—শ্রবণ ও বিশ্বাসের মাধ্যমে স্বীকার করে নেয়ার অর্থে। ঐ ধরনের আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তায়ালা কর্ণ, চক্ষু ও বিবেকসম্পন্ন কাফিরদেরকে কবরে অবস্থিত মৃতদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই তুলনাটি কিন্তু শ্রবণ ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে নয়, বরং একগুঁয়েমি ও নির্লিপ্ত মনোভাবের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, অনিচ্ছা ও অবিশ্বাসের ক্ষেত্রে। মৃত্যুর ব্যাধির সময় পরবর্তী জগতে নিজের স্থান দর্শনের পর কোন কাফির যদি বিশ্বাস করার ইচ্ছা পোষণ করে, তাতে তার কোন লাভ হবে না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, "পরকালে যারা বদকার (পাপী) হিসেবে চিহ্নিত, তাদের প্রতি আপনার বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান তাদের জন্য কোন সুফলই এনে দিবে না" (আল-আয়াত)। এই ধরনের লোকদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান তাদের কোন কাজে আসবে না, ঠিক যে রকম কাজে আসবে না সেই ধরনের কবরবাসীদের বিশ্বাস, যারা কবরে যেয়ে প্রত্যক্ষ করে বিশ্বাস করেছে, অথচ তাদের প্রত্যক্ষ না করেই বিশ্বাস করা উচিত ছিল। মৃতদের এ রকম বিশ্বাস গ্রহণীয় হবে না। আয়াতে উল্লেখিত 'শ্রবণ'-এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে 'স্বীকৃতি'। উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ বলে—"এ মেয়েলোকটি এমনই মেয়েলোক যে, সে কোন কথাই শুনে না"—তখন সে বোঝায় যে, মহিলাটি শুনেও কথায় মনোনিবেশ করে না। কাফিরদের প্রতি অবতীর্ণ দুটো আয়াতেই শ্রবণ শব্দটি এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাফিররা জীবিত এবং তাদের কর্ণ ও চক্ষু আছে, কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ পাক তাদেরকে পাপিষ্ঠ বানিয়েছেন এবং তাদের হৃদয়গুলোকে মোহর মেরে দিয়েছেন, সেহেতু তিনি তাঁর নবী (সঃ)-কে বলছেন, "আপনি তাদেরকে শোনাতে পারবেন না"—অর্থাৎ. "আপনি যখন তাদেরকে বলবেন, তখন তারা বিশ্বাস করবে না। তাদের বিশ্বাসকে গ্রহণ করা হবে না, ঠিক যে রকম কবরস্থ কাফিরদের বিশ্বাসকে গ্রহণ করা হবে না।" হাদীসসমূহে বিবৃত হয়েছে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

যে. মৃতজন শ্রবণ করতে পারেন। যেই অর্থ ঐ হাদীসগুলোতে বিবৃত হয়েছে তাতে প্রতিভাত হয় যে, মৃতজন কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করে থাকেন। তবে, উপরোক্ত দুটো আয়াতেই 'শ্রবণ' অর্থ হচ্ছে 'গ্রহণ' (স্বীকার)। যুক্তিসঙ্গত চিন্তাধারার অধিকারী যে কোন ব্যক্তিই শ্রবণের এই দুটো অর্থের পার্থক্য স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন। "আপনি তাদেরকে শোনাতে পারবেন না"—আয়াতটির পর আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, "আপনি শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারবেন, যারা ঈমান এনেছে।" আল্লাহ্ জ্ঞাত করেন যে, ঈমানদারগণ শ্রবণ করতে সক্ষম। এই বিবৃতি থেকেও বোঝা যায় যে, 'শ্রবণের' অর্থ 'স্বীকার' বা 'গ্রহণ' করে নেয়া। যদি কেউ বলে যে, 'আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না' বাক্যটির অর্থ, তারা কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করতে পারে না, তাহলে আল্লাহ্ বোঝাচ্ছেন যে কবরস্থ মু'মিনগণ শ্রবণ করতে পারেন (অর্থাৎ, আয়াতের অবশিষ্টাংশ-কেও একই অর্থে গ্রহণ করতে হবে ব্যক্তিটিকে—অনুবাদক)। আর এটাই আমাদের বক্তব্য, যা আমরা বলতে চাচ্ছি। যেহেতু কুরআন-এ করীমে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে যে, মৃত ঈমানদারগণ শুনতে পান সেহেতু কেউই একে অস্বীকার করতে পারবে না—যদি সেই ব্যক্তি কুরআনের পর মুসলিম-গণের কাছে গৃহীত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল হাদীসসমূহের অস্বীকার করেও।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন যে, শুধুমাত্র মৃত কাফিররা শুনতে পায়নি। কারণ তাঁর রেওয়ায়েতকৃত একটা হাদীস ঘোষণা করে, "যখন কোন মুসলিম তার কোন মুসলিম ভ্রাতার কবর যিয়ারত করে এবং কবরের পাশে বসে, তখন কবরস্থ মুসলিমটি তাকে চিনতে পারে এবং তার সালামের প্রত্যুত্তর দিয়ে থাকে" (হাদীস)। হাদীসটি আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। মৃত ব্যক্তির এই চিনবার এবং সাড়া দিবার ক্ষমতা প্রতীয়মান করে যে, সে যিয়ারতকারীকে দেখতে পায় এবং তার সালাম শুনতে পায়। যদিও হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছিলেন যে, মৃত কাফিররা শুনতে পায় না, তবুও তিনি আরও বলেছিলেন যে, তারা জানতে সক্ষম, তাঁর বর্ণিত একটা হাদীসে ইরশাদ ফরমান—

انهم ليعلمون الآن ان ما كنت اقول لهم حق -

অর্থাৎ, "কাফিররা এখন জানে যে, আমি সত্য বলতেছিলাম" (হাদীস)। উলামা-এ কেরাম ঘোষণা করেছেন যে, ব্যক্তি 'শ্রবণের' মাধ্যমেই 'জানতে' পারে। অতএব, এই দুটো শব্দের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়েম আল জাওযিয়া, ইবনে রাজাব ও ইমাম আস্-সুয়ুতী এবং আরো বহু উলামা বলেছেন যে, উপরোক্ত ব্যাখ্যাই সত্য, সঠিক। যদি কিছু অজ্ঞ লোকের কথানুযায়ী 'মৃত্যুর' অর্থ হলো 'অনস্তিত্ব', তাহলে মৃতজনের সকল ইন্দ্রিয়ই অস্তিত্ববিহীন হয়ে পড়ত। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণিত এবং বুখারী শরীফে লিপিবদ্ধ হাদীসটি ব্যক্ত করে যে, মৃতজন জানতে সক্ষম; অতএব, হাদীসটি থেকে প্রতিভাত হয় যে, মৃতজনের ইন্দ্রিয় চেতনা বিলুপ্ত হয় না। অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে যে, মৃতজন শুনতে পান। 'শ্রবণ' অর্থ 'স্বীকার ও বিশ্বাস করে নেয়া'—হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এই ধারণাটি উলামাগণের ইজমার সঙ্গে মতভেদ সৃষ্টি করেছে। তাঁর কথার সঙ্গে সাহাবা-ই কেরামের কথার সর্বোত্তম সঙ্গতি আনতে সক্ষম একমাত্র সেই হাদীসটিই, যা মাযার যিয়ারত সংক্রান্ত, আর যা হযরত আয়েশা (রাঃ)-ই রেওয়ায়ত করেছেন।

'আল-হিদায়া' গ্রন্থের শরহে (ব্যাখ্যায়) ইবনুল হুমাম লিখেছেন, "শপথ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হানাফী উলামাই কিরাম বলেন : 'মৃতজন শ্রবণ করতে পারেন না। যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সঙ্গে কথা না বলার শপথ করে এবং উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সঙ্গে কথা বলে, তাহলে তার শপথ ভাঙ্গবে না। অপর পক্ষে, মিশকাত শরীফের শরহে বদরের জিহাদে নিহত কাফিরদের সম্পর্কে হাদীসটি ব্যাখ্যাকালে মোল্লা আলী আল-কারী লিখেন: "শপথ সংক্রান্ত বিষয়ের উপর হানাফী উলামার মন্তব্যসমূহ, (ভাষাগত) প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সব কথা পরিস্ফুট করে না যে, মৃতজন শ্রবণ করতে পারেন না। 'শপথ' সংক্রান্ত জ্ঞান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হানাফী উলামা-ই কিরাম বলেন, 'যদি কোন ব্যক্তি গোস্ত না খাওয়ার শপথ করে থাকেন এবং এর পর মাছ ভক্ষণ করেন, তবে তাঁর শপথ ভাঙ্গবে না।' অথচ, আল্লাহ্ পাক মাছকে 'সুস্বাদু' গোশতস্বরূপ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু মাছের গোশত প্রথানুযায়ী (সাধারণ) গোশত থেকে পৃথক। অনুরূপভাবে, যদি কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা না বলার শপথ করেন এবং অপর ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গে কথা বলেন, তবে তাঁর শপথ ভাঙ্গবে না। কারণ, 'কথোপকথন' এর অর্থ প্রথানুযায়ী 'মুখোমুখি' হয়ে বাক্যালাপে রত হওয়া। একজন মৃত ব্যক্তি শ্রবণ করতে পারেন, কিন্তু যেহেতু তিনি স্বাভাবিক শ্রবণ উপযোগী পদ্ধতিতে কথা বলেন না, সেহেতু প্রথানুসারে উভয়ের মধ্যে কথোপকথন সংঘটিত হতে পারে না। এ কারণেই তাঁর (জীবিত ব্যক্তির) শপথ ভঙ্গ হবে না, মৃত ব্যক্তির শ্রবণ না করার কারণে নয়' (মোল্লা আলী কারী)। ইবনুল হুমাম, হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কথা উদ্ধৃত করে বলেন যে, বদরের জিহাদে নিহত কাফিরদের সঙ্গে হুযুর (সঃ)-এর সংলাপ বর্ণনাকারী হাদীসটি অশুদ্ধ। ইবনুল হুমাম আরো লিখেছেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছিলেন যে, নবী করীম (সঃ) এ ধরনের কোন কথাই বলতে পারেন না, যেহেতু আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, "আপনি মৃতদের শোনাতে পারবেন না। আপনি কবরের মধ্যে অবস্থিতদের শুনাতে পারবেন না" (আয়াত) কিন্তু হাদীসটি সর্বসম্মতিক্রমে বর্ণনা হয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) এতে বিশ্বাস করেন নি-এ কথাটা আমরা গ্রহণ করতে পারি না। তা ছাড়া উক্ত আয়াত এবং হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধই নেই। আয়াতের মধ্যে 'মৃত' শব্দটি কাফিরদের প্রতি আরোপিত আর 'শ্রবণ'-এর নেতিবাচক অর্থ হচ্ছে, এটা তাদের কোন কাজে আসবে না; কাফিররা শ্রবণে অক্ষম, এই অর্থে ব্যবহৃত হয়নি শব্দটা। "কাফিররা মূক, বধির, অন্ধ; তারা বুঝতে অক্ষম"—আয়াতটাও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের চোখ, কান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ ঘোষণা করেন যে, তারা অন্ধ ও বধিরের মত, যেহেতু তারা হুযুর (সঃ)-এর ইসলাম এবং সঠিক পথের দিকে আহ্বানকে উপেক্ষা করেছিল। কুরআনের আয়াত —"আপনি মৃতদের শোনাতে পারবেন না" ব্যাখ্যাকালে ইমাম কাযী বায়দাওয়ী বলেন, "কাফিররা ঠিক সেই সব লোকদের মত, যারা সত্য সঠিক কথা শ্রবণকালে কানে তালা দেয়। আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকেই শ্রবণ করার ক্ষমতা প্রদান করে থাকেন, যাঁদেরকে তিনি ইচ্ছা করেন; আর তাঁরাই হলেন নাজাতপ্রাপ্ত।" অবিশ্বাসের মধ্যে একগুঁয়েদেরকে আল্লাহ্ মৃতদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। উপরোক্ত আয়াতটি নিম্নোক্ত আয়াতের মতই—"যাদেরকে আপনি ভালবাসেন তাদেরকে চাইলেই বিশ্বাস করাতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান তাকে ঈমানদার বানাতে পারেন।" ইবনুল হুমাম বলেন, "মৃতদেরকে শোনানো একমাত্র হুযুর (সঃ)-এর জন্যই খাস।" কিন্তু আমাদের কাছে হুযুর পুর নূর (সঃ)-এর জন্যই কোন বিষয় খাস হওয়ার পক্ষপাতী ব্যক্তিকে প্রামাণ্য দলিল দেখাতে হবে। ঐ ধরনের কোন দলিল এ বিষয়ে নেই। হযরত উমর (রাঃ)-এর প্রশ্নটি অথবা তার উত্তরটি কোনটিই ঐ ধরনের ইঙ্গিত বহন করে না। যদিও ইবনুল হুমাম বলেছেন, "বদরের জিহাদে নিহত কাফিরদের সঙ্গে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বাক্যালাপ আসলে একটা প্রবাদ বাক্যে উচ্চারণের মতই" তবুও হযরত উমরের প্রতি প্রদত্ত উত্তরটা পরিস্ফুট করে যে, একথা সত্য নয়। ইবনুল হুমাম বলেন, মুসলিম শরীফে লিপিবদ্ধ হাদীসটি, যেটাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে মৃতজন দাফনের পরবর্তী সময়ে দাফনকারীদের প্রস্থানকালীন পদশব্দ শুনতে পান, সেটাতে প্রতিভাত হয় যে মৃতজন ফেরেশতাদের প্রশ্নসমূহ শুধুমাত্র প্রশ্ন পেশকালীন সময়েই শুনতে পান। আরও প্রতিভাত হয় যে তাঁরা প্রশ্ন পর্ব শেষ হওয়ার পর আর কখনো শুনতে পান না। কারণ আয়াতটিতে পরিস্ফুট হয়েছে যে, মৃতজন শ্রবণ করতে অক্ষম। কাফিররা যে শ্রবণ করতে অক্ষম, তা বুঝাতে গিয়ে আল্লাহতায়ালা তাদেরকে মৃতদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আমাদের উত্তর হচ্ছে, এই যুক্তিটি নিজেকেই ভুল প্রমাণ করে। কারণ যে ব্যক্তি বলে যে মৃতজন দাফনের পর পরই শুনতে সক্ষম। তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে তাঁরা সবসময়ই শুনতে সক্ষম। আর কোন আলেমই বলেন নি যে, মৃতজন প্রশ্ন পর্বের পর আর শ্রবণ করবেন না। উপরন্তু, তাঁরা দাফনের পর কিছুকাল শ্রবণ করতে পারবেন' এই ধারণাটিকেও তাহলে আয়াতের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বিবেচনা করতে হবে।

আহল এ সুন্নাতের উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মতানুযায়ী মৃতজনকে সালাম দেয়া সুন্নাত। মাসাবিহ্ এর শরহে মহান আলেম ইবনে মালেক কবরস্থ মৃতজনকে সালাম দেয়ার হাদীসটি ব্যাখ্যাকালে বলেন, যারা বলে যে, মৃতজন শ্রবণ করতে অক্ষম তাদেরকে হাদীসটি ভ্রান্ত প্রমাণ করে। পরবর্তী হাদীস, যা লিপিবদ্ধ আছে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের সুনান এবং আবুদাউদের গ্রন্থে, হাকিমের মুসতাদরাক, ইবনে আবি শায়বার আল মুসান্নাফ বায়হাকীর আযাবুল কুবুর আত তায়ালিসি ও আবদ্ ইবনে হামিদের 'মুসনাদ' গ্রন্থ দুটোতে, হাম্মাদ ইবনে আস সিররীর আয যুহদ' গ্রন্থে, যার মধ্যে ইবনে জারির তাবারি এবং ইবনে আবি হাতেম ও বাররা ইবনে আযিব কর্তৃক লিপিবদ্ধ সহীহ সনদের উল্লেখ আছে, সেই হাদীসটাতে হুযুর পুর নূর (সঃ) ইরশাদ ফরমান ঃ

فی المؤمن ینـاد منار من السماء صدق عبدی فافر شوا له من الجنة و البسوه من الجنة و افتحوا له بابا من الجنة فیبا تیه من رو حها وطیـبها و یفسح له فی مد بصره ویتیه رجل حسن الوجه حسن الثـیاب طیـب الر یح فیقول ابشر بالذی یسرلـك فیـقول له من انت فوجهك الوجه الذی یاتی با لخیر فیـقول ا نا عملـك الصا لح فیـقول رب ا قم السا عه رب اقم السا عة حتی ار جـع الی ا هلی و ما لی -

অর্থাৎ, মৃত মুসলিমের স্বপক্ষে একটা কণ্ঠস্বরকে বলতে শুনা যাবে, 'আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে'। একটা বেহেশতী পর্দা তার জন্য বিছিয়ে দেয়া হবে এরপর মুসলিমটাকে বেহেশতী পোষাক পরিধান করানো হবে। বেহেশতের একটা দরজা তার জন্য খুলে দেয়া হবে। ফলে বেহেশতী সুগন্ধ কবরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। তার দৃষ্টি যতদূর যাবে ততদূর কবরের আকৃতি প্রসারিত হবে। এরপর কবরের মধ্যে প্রবেশ করবে একজন সুদর্শন ও সুন্দর পরিচ্ছদাবৃত ব্যক্তি। তাঁর শরীর থেকে সুগন্ধ বের হতে থাকবে। মৃত মুসলিমটা তাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'আপনি কে? আপনার মুখমণ্ডল কেন এত জ্যোতির্ময়?' লোকটা উত্তর দিবে, 'আমি হলাম আপনার নেক আমল।' তখন মুসলিমটা বলবে, 'হে আমার আল্লাহ্! পুনরুত্থান অতি সহজে সংঘটিত হোক, যাতে আমি আমার গৃহস্থালী ও সম্পত্তির সাক্ষাৎ পেতে পারি' (হাদীস)। এর বিপরীত—আযাব—পতিত হয় মৃত কাফিরদের উপর। এই হাদীসটি প্রতীয়মান করে যে, মৃতজন শোনেন, দেখেন, কথা বলেন, ঘ্রাণ নেন, উপলব্ধি করেন, চিন্তা করেন এবং উত্তর দেন। এগুলোর সবই প্রশ্ন পর্বের পর কবরের মধ্যে সংঘটিত হয়। উলামায়ে কিরাম সর্বসম্মতভাবে জানিয়েছেন যে এটাই সত্য। ইমাম

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আস সুয়ূতীর মত হাদীসের ইমামগণ বলেছেন যে, এই হাদীসটি 'মুতাওয়াতির—অর্থাৎ, নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলোর মধ্যে অন্যতম। হাদীসটি পরিস্ফুট করে যে, মৃতজনকে সালাম জানানো জীবিতদেরকে সালাম জানানোর মতই ব্যাপার; আর এও প্রতিভাত হয় যে, মৃতজন শ্রবণ করতে সক্ষম" (ইবনে মালিক কৃত শরহে মাসাবিহ্)। 'ফাতওয়া-এ হিন্দিয়া' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, "ইমামুল আযম আবু হানীফা ঘোষণা করেছেন যে, কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ নয়। ইমাম মুহাম্মদ শায়বানীর কথা থেকে আরও বোঝা যায় যে, মেয়েদের জন্যও কবর যিয়ারত করা অনুমতি-প্রাপ্ত।" 'তাহ্যিব' গ্রন্থে লিখা রয়েছে, "কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। মৃতদের যিয়ারত করা যেন তাদের সঙ্গে জীবদ্দশায় সাক্ষাৎ করার মতই ব্যাপার—তবে, তা সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতার উপর নির্ভরশীল। 'খাযানাতুল মুফতীন' কিতাবেও একই মত ব্যক্ত হয়েছে। কবর যিয়ারতকালে প্রত্যেকের উচিত জুতা খুলে ফেলা। কবরস্থ মৃত ব্যক্তির মুখের দিকে মুখ করে কাবার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যেককে বলতে হবে, "আস্‌ সালামু আলাইকুম ইয়া আহ্‌লুল কুবুর! আল্লাহ্‌ তায়ালা আপনাদের এবং আমাদের ক্ষমা করুন। আপানারা আমাদের পূর্বসূরী এবং আমরা আপনাদের অনুগামী।" 'গুরারাইব' পুস্তকটিও একই বক্তব্য পেশ করে। কবরস্থানে নিম্নস্বরে অথবা উচ্চস্বরে সূরা এ মুলক্‌ তেলাওয়াত করা যেতে পারে। 'যাহিরা' গ্রন্থের 'কবরের পার্শ্বে কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত' অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে যে, অন্যান্য সূরাও পাঠ করা যেতে পারে। কাযী খানের ফাত্‌ওয়াসমূহে লিপিবদ্ধ আছে যে, সেই ব্যক্তি কবরস্থ মৃত ব্যক্তির মনে আনন্দ দেয়ার জন্য কুরআন মজীদ উচ্চস্বরে পড়ার ইচ্ছা রাখে, সে তা করতে পারে; আর যেই ব্যক্তি নিঃশব্দে পড়তে চায়, সেও তা করতে পারে। কারণ আল্লাহ্‌ কুরআন 'তিলাওয়াত' শুনতে পান—যেভাবেই তা পড়া হোক না কেন। 'বাযাযিয়দ' গ্রন্থটি বলে, "কবরস্থানের সবুজ ঘাস তুলে নেয়া মকরূহ; যেহেতু প্রত্যেকটা ঘাসের পাতাই আল্লাহ্‌ তস্‌বিহ্‌ পাঠে রত। এই তসবিহ মৃত ব্যক্তিকে স্বীয় কবর আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেয়। মৃতজন এ সকল তসবিহ দ্বারা স্বস্তি অনুভব করেন।' আশ্‌ শার্নব্লালীর 'ইমদাদুল ফাত্‌তাহ' গ্রন্থে এবং অন্যান্য হানাফী উলামার পুস্তকেও একই কথা লিখা রয়েছে। যদি মৃতজন ঘাসের তসবিহ পাঠ শোনতে পান, জীবিতরা শোনতে পায় না যে ব্যাপারটি ফাতওয়া প্রদানের ক্ষমতা সম্পন্ন মহান উলামা-কিরাম ঘোষণা করেছেন সত্য হিসাবে—তাহলে এ কথা কিভাবে ধারণা করা যায় যে, মৃতজন তাঁদের প্রতি সম্ভাষণ দানকারী ব্যক্তিদের কথা শোনবে না। যাঁরা বলেছেন যে মৃতজন শ্রবণ করতে পারবেন না, তাঁরা সম্ভবত বুঝিয়েছেন যে, জীবিতদের মত কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করতে তাঁরা অক্ষম। এই মাপকাঠিতে ফিকাহ কিতাবগুলোর মধ্যে শপথ' অধ্যায়ে বর্ণিত বক্তব্যগুলোর পারস্পরিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং নবীজি (সঃ)-এর হাদীসও বিশ্বাস করা যায়, আর ফলস্বরূপ এর উপর উলামাগণের মতৈক্যও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যদি কেউ বলে যে, ইমাম আল-মযহাব হযরত আবু হানীফা (রহঃ) এটা বিশ্বাস করেন নি" তবে আমাদের উত্তর হচ্ছে যে, এই মহান ইমামও অন্যান্য ইমাম আল-মযহাবদের মত ঘোষনাকরেছেন, "আমার মযহাবসহীহ হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত তিনি হুযুর (সঃ)-কে অনুসরণ করতে গিয়ে মুরসাল এমন কি যয়ীফ হাদীসও তাঁর মযহাবের জন্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তা হলে এ কথা কিভাবে ধারণা করা যায় যে, তিনি সহীহ হাদীস অমান্য করবেন? এখানে বোঝা যায় যে,

কিছু উলামা 'মৃতজন শ্রবণে অক্ষম' কথাটি বলে বুঝিয়ে ছেন যে, তাঁরা পৃথিবীতে জীবিতদের শ্রবণ করার পদ্ধতি অনুযায়ী শ্রবণ করেন না। কারণ সহীহ

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

হাদীসকে অমান্য করে অন্য কারও কথার অনুগামী হওয়ার অনুমতি কোন আলেমেরই নেই।

হানাফী উলামাগনের ইজমা অনুযায়ী হুযুর (সঃ) এবং তাঁর সঙ্গে সমাধিস্থ সাহাবা ই-কিরামের মাযার যিয়ারত করা, সালাম জানানো এবং তাঁদের শাফায়াত প্রার্থনা করা সুন্নাত। যদি তাঁরা বিশ্বাস না করতেন যে, নবীজি (সঃ) ও সাহাবাগন শোনবেন, তবে তাঁদের কথা পরস্পর বিরোধী হতো, এমন কি মাযার যিয়ারত করা সুন্নাত' এই ফাতওয়াতেও তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিত। শপথ' সংক্রান্ত বিষয়ে হানাফী উলামার কথাগুলোকেও যদি 'পৃথিবীতে জীবিতদের শ্রবণের' অর্থে নেয়া হয়, তাহলেও আর কোন মতপার্থক্য বিরাজ করবে না।

সম্পূরণ ঃ ইবনে তাইমিয়া তাঁর প্রণীত কিতাবুল ইনতিসার ফিল ইমামুল আহমদ পুস্তকে লিখেছেন বদরের জিহাদে নিহত কাফিররা যে হুযুর (সঃ)কে-শুনেছিল—এ কথা বিশ্বাস না করাটা হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর জন্য দোষযুক্ত নয়, কারণ তিনি হাদীসটি শোনেন নি। কিন্তু অন্যদের জন্য এতে বিশ্বাস না করা দোষযুক্ত হবে, যেহেতু এই হাদীসটি বিপুল প্রসার লাভ করে এবং সকল ইসলামী বিশ্বাসের একটাতে পরিণত হয়, যার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা একান্ত অপরিহার্য। ইবনে তাইমিয়া বুঝাতে চেয়েছেন যে, বদরের জিহাদে নিহত কাফিরদের শ্রবণ করার ব্যাপারটার উপর অবিশ্বাসীরা কাফেরে রূপান্তরিত হবে। কারণ মযহাবের কিতাবসমূহে লিখা রয়েছে যে,যেই ব্যক্তি ইসলামের এমন কোন বিষয় যেটার উপর পরিপূর্ণ ঈমান আনা অপরিহার্য, সেটা যদি অবিশ্বাস করে, তবে সে কাফিরে পরিণত হবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং স্বল্প সংখ্যক উলামা, যাঁরা বলেছিলেন যে, মৃতজন শ্রবণ করতে অক্ষম, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, মৃত কাফিররাই শ্রবণ করতে অক্ষম। কিন্তু হুযুর (সঃ) এবং আউলিয়া-ই-কিরাম ও শহীদগণ শুনতে না পাওয়ার উপর কোন আলেমই বিশ্বাস করেন নি। হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং অন্যান্যরাও তাঁদের শ্রবণ ক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন। মৃতজন,এমন কি হুযুর (সঃ)-ও শ্রবণ করতে অক্ষম - ওহাবীদের এই অভিযোগটি কি রকম জঘন্য পর্যায়ের, তা সহজেই অনুমেয়।

মহান আল্লাহ্ তায়ালা যিনি কাহ্হার' তিনি এ সব গোমরাহ লোকদেরকে চরম শাস্তি দিবেন নিঃসন্দেহ। মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করার উপর প্রদত্ত ফাতওয়া সমূহে ইবনে তাইমিয়া জিজ্ঞাসা করে, মৃতজন কি তাদের যিয়ারতকারীদেরকে চিনতে পারেন ? তাঁদের পরিচিত কিংবা অপরিচিত এমন কোন ব্যক্তি যদি তাঁদের কবর যিয়ারত করে তাহলে কি তাঁরা বুঝতে পারেন যে একজন যিয়ারতকারী এসেছিল ? এর পর ইবনে তাইমিয়া উত্তর লিখেন ঃ "হাঁ" তাঁরা চিনতে এবং বুঝতে পারেন।" সে আরও সেই সব রেওয়াতের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে যেগুলোতে মৃতজনের একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাতকার, কুশলাদি বিনিময় এবং জীবিতদের কর্মফল প্রদর্শিত হওয়ার পর আলাপ আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। হযরত খালিদ ইবনে যাইদ আবু আইয়ুব আল আনসারী (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রিওয়াত করেন নবীজী (সঃ)-এর হাদীস

اذا قبضت نفس المو من تلقاها اهل الر حمة من عبا د الله كا يتلقون البشير فى الد نيا فيقبلون عليه و يسئاو نه فيقول بعضهم لبعض انظروا اخاكم يستريح فا نه كان فى كرب شد يد قال فيقبلون عليه ويسئلو نه ما فعل فلان ما فعلت فلا نه هل تز وجت -

অর্থাৎ ঈমানদার ব্যক্তির রূহকে তার মৃত্যুর সময় একজন নিয়ামতের ফেরেশতা গ্রহণ করেন। মৃতজন তাকে ঘিরে ধরে রাখে, ঠিক পৃথিবীর শুভ সংবাদ শ্রবণের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিবর্গের মত। তারা তাকে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে আর কিছু মৃতজন তখন বলে, তোমাদের ভাইকে একা থাকতে দাও, যাতে সে বিশ্রাম নিতে পারে। সে একটা অস্বস্তিকর স্থান থেকে এসেছে। তবুও তারা তাকে ঘিরে ধরে থাকে। মৃতজনরা এ পৃথিবীতে তাদের পরিচিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে অমুক জন কি কাজ করে ? অমুক কি বিয়ে শাদী করেছে ? (আল-হাদীস)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ওয়াহাবী মতবাদ খণ্ডনে ঐশী অবদান

গাযী সালাহ্উদ্দীন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আল্লাহ্ ইরশাদ করেন যে, শহীদগণ তাঁদের কবরে জীবিতাবস্থায় রয়েছেন এবং তাঁরা সেখানে রিযিকও পেয়ে থাকেন। একটা হাদীসে বিবৃত হয়েছে যে, শহীদগণের রূহ্সমূহ বেহেশতী হবেন। যদিও কিছু উলামা বলেছেন যে, এ সব রহমত শুধু শহীদগণের জন্যই নির্দিষ্ট, সিদ্দিকগণের জন্য নয়, তবুও আহ্‌লে-এ-সুন্নাতের ইমামগণ যা বলেছেন তাই সত্য ও সঠিক; জীবন, রহমত এবং রূহসমূহের বেহেশতে গমন শুধু মাত্র শহীদগণের জন্য খাস নয়। ইমামগণ ঘোষণা করেন যে, এ তথ্যটি কুরআন ও হাদীস থেকে বের করা হয়েছে। এ বিষয়টি শহীদগণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, মুসলিমগণ মৃত্যুর ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন মনে করে জিহাদে অংশ গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবার আশংকা সম্ভাবনা ছিল। মুসলিমদের মন থেকে সন্দেহ দূর করে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে শহীদ হওয়ায় অনুপ্রাণিত করাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। কুরআনের আদেশ—'দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না'-ও এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও দারিদ্র্যের ভীতি যেখানে নেই সেখানেও হত্যা করার অনুমতি নেই, তবুও আয়াতটি এমন কতকগুলো ঘটনা সংঘটনকালে নাযিল হয়েছিল, যখন বহু মানুষ দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করত।

এতক্ষণ আমরা হাররানের আহমদ ইবনে তাইমিয়ার দলিল পেশ করলাম। ওহাবীরা বলে যে, তারা ইবনে তাইমিয়ার অনুসারী; অথচ, তার পুস্তকাদি ও ধ্যান-ধারণা বুঝতেই অজ্ঞতার পরিচয় দেয় এই ওহাবীরা। ইবনে তাইমিয়া বলে যে, মৃতজন শহীদগণের মতই জীবিত এবং তাঁরা সেখানে (কবরে) নিয়ামত পান। ওহাবীরা তার অনুগামী হওয়ার কথায় কিভাবে মানুষেরা বিশ্বাস করবে, যখন তারা তারই কথা অমান্য করে কথা মান্যকারী মানুষদেরকে কাফির ও মুশরিক আখ্যা দেয় ? এ সব বুদ্ধিমানরা (?) বলে যে রসূল-এ-মকবুল (সঃ) শ্রবণ, দর্শন, উপলব্ধি এবং যিয়ারতকারী ও তার শাফায়াত প্রার্থনাকে বুঝতে অক্ষম, তারা প্রকৃতপক্ষে কাউকেই অনুসরণ করে না একমাত্র তাদের নফসানীয়াতকে ছাড়া। আল্লাহ্ ওহাবীদেরকে প্রকৃত ইলম দান করুন, আমিন !

মৃতজন যে জীবিতদের দেখতে পান, তার প্রামাণ্য দলীলগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

ما من ميت الا يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار.

অর্থাৎ "সকাল-সন্ধ্যায় প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিকেই পরবর্তী জগতে তার (ভবিষ্যত) স্থান প্রদর্শন করা হয়। বেহেশত প্রাপ্তকে তার স্থান দেখানো হয়, আর দোযখীকেও তার স্থান দেখানো হয় (হাদীস)।" হাদীসটির রিওয়ায়াতকারী হচ্ছেন আল বুখারী। 'প্রদর্শন' শব্দটির অর্থ তারা দেখতে পায়। ফিরাউনের লোকজনদের সম্পর্কে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, "তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় জাহান্নামের আগুন প্রদর্শন করা হয়" (আল-আয়াত)। যদি মৃতরা দর্শন না করত, তবে 'প্রদর্শন' এর কোন অর্থ হত্তো না।

(২৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ওয়হাবী মতবাদ খণ্ডনে ঐশী অবদান

(২০৮ পৃষ্ঠার পর)

আমর ইবনে দিনারের উদ্ধৃতি দিয়ে আবু নুয়াইম একটি হাদীস রিওয়ায়াত করেন :

مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ اِلَّا وَرُوحُهُ فِي يَدِ مَلَكٍ يَنْظُرُ اِلَى جَسَدِهِ كَيْفَ يُغْسَلُ وَكَيْفَ يُكَفَّنُ وَكَيْفَ يُمْشَى بِهِ وَيُقَالُ لَهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ اِسْمَعْ ثَنَاءَ النَّاسِ عَلَيْكَ -

অর্থাৎ, "যখন একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন একজন ফেরেশতা তার রুহকে ধরে রাখে। রুহ দেহের গোসল দান ও কাফনের কাপড় পরিধান সব কিছু দর্শন করে। তাকে বলা হয় : 'মানুষেরা কিভাবে তোমার প্রশংসা করে, তা শ্রবণ কর (আল-হাদীস)।" আমর বিন দিনার থেকে নকল করে ইবনে আবিদ দুনইয়া বর্ণনা করেন রসূল-এ-আকরাম (সঃ)-এর হাদীস :

مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ اِلَّا وَهُوَ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ فِي اَهْلِهِ بَعْدَهُ وَاِنَّهُمْ لَيُغَسِّلُونَهُ وَيُكَفِّنُونَهُ وَاِنَّهُ لَيَنْظُرُ اِلَيْهِمْ -

অর্থাৎ, "মৃত ব্যক্তি তার মৃত্যুর পর স্বীয় স্ত্রী এবং সন্তানদের জীবনে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত থাকে। তাকে গোসল ও কাফনের কাপড় পরিয়ে দেয় যারা, তাদেরকেও সে দেখে। (আল-হাদীস)।" আল-বুখারী উদ্ধৃত একটা সহীহ্ হাদীস ঘোষণা করে :

اِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَقُولَانِ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَسْئَلَةِ اُنْظُرْ اِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرًا هُمَا جَمِيعًا -

অর্থাৎ, "প্রশ্নপর্ব শেষ হওয়ার পর মুনকার-নাকির ফেরেশতাদ্বয় মৃত ব্যক্তিকে বলে, দোযখে তোমার স্থানটি দর্শন কর। আল্লাহ্ তা পরিবর্তন করে বেহেশতে তোমাকে একটা স্থান মঞ্জুর করে দিয়েছেন।' সে উভয় স্থান দর্শন করে।' (আল হাদীস)

আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে আবিদ দুনইয়া ও আল বায়হাকী তাঁর 'শুঅব' গ্রন্থে একটা হাদীস রিওয়ায়াত করেন : "যখন কোন ব্যক্তি তার পরিচিত কোন মৃত ব্যক্তির কবর যিয়ারত করে সালাম জানায়, তখন মৃত ব্যক্তি তাকে চিনতে পারে এবং সালামের প্রত্যুত্তর দেয়। যদি জীবিত ব্যক্তিটি অপরিচিত কোন মৃত ব্যক্তির কবরের পাশে যেয়ে সালাম জানায়, তবে মৃত ব্যক্তি তার প্রত্যুত্তর দেয়' (হাদীস)। এ হাদীসে প্রতিভাত হয় যে, মৃতজন তাঁদের কবরের পাশে আগমনকারী ব্যক্তিদেরকে দেখতে পান। যদি তাঁরা না দেখতেন, তাহলে হাদীসটিতে উল্লেখ করা হতো না যে, মৃত ব্যক্তি তাঁর দুনিয়াবী জীবনে অপরিচিত কোন ব্যক্তির সালাম কবরস্থ হওয়ার পর গ্রহণ করবেন এবং প্রত্যুত্তর দেবেন। প্রথমোক্ত (মৃত) ব্যক্তি চিনতে পেরে সালামের প্রত্যুত্তর দেন; দ্বিতীয় জন না চিনেও সালামের উত্তর দেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং হাকীম, হযরত

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আয়েশা (রাঃ)-এর কথাকে উদ্ধৃত করেনঃ 'আমার স্বামী [হুযুর-(সঃ)] এবং আমার পিতা [হযরত আবু বকর-(রাঃ)]-কে দাফন করার পর আমি যখন আমার ঘরে যেতাম, তখন পর্দা করতাম। হযরত উমরকে সেখানে দাফন করার পর আর আমি কখনো বেপর্দায় যাইনি। কারণ তিনি আমার নিকটাত্মীয় ছিলেন না। আমার লজ্জা দ্বারা পরিচালিত হয়েই আমি তা করতাম, যেহেতু তিনি সেখানে ছিলেন।' 'আরবানুত তাইয়্যা' কিতাবে লিপিবদ্ধ একটি হাদীস ঘোষণা করেঃ

قَالَ اَنَسٌ مَايَكُونُ الْمَيِّتُ فِىْ قَبْرِهٖ اَذَا

زَارَهٗ مَنْ كَانَ يُحِبُّهٗ فِىْ دَارِ الدُّنْيَا -

অর্থাৎ, ''মৃত ব্যক্তির ইহজীবনে ভালবাসাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যদি তার যিয়ারত করে, তবে সে অত্যধিক আনন্দিত হয়' (হাদীস)।" হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মৃত ব্যক্তি যিয়ারতকারীকে দেখতে পান। যদি তিনি না দেখতে পেতেন, তাহলে তো আনন্দিত হওয়ার কথাই উঠত না। সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আমর ইবনুল আসের মৃত্যু-পূর্বকালীন কথা উদ্ধৃত হয়েছেঃ 'যখন তোমরা আমাকে দাফন করবে, তখন আমার উপর মাটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেবে। তারপর ততটুকু সময় আমার কবরের পাশে অবস্থান করবে, যতটুকু সময় একটা জন্তুকে জবেহ করে টুকরা টুকরা করতে লাগে। তোমাদেরকে আশেপাশে দেখলে হয়ত আমি আমার কবরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারব এবং আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর অতি সহজেই দিতে পারব।' এ ধরনের বহু রিওয়ায়াত আছে মৃতজনের শ্রবণ ও দর্শন 'ক্ষমতা সম্পর্কে'। প্রয়োজন অনুযায়ী যতগুলো দরকার ততগুলো আমি উদ্ধৃত করছি। আমি মনে করি যে, এর চেয়ে বেশী আর লিখার প্রয়োজন নেই।

আমরা উপরে লিখেছি যে, জীবিতদের আমলনামা মৃতজনকে দেখানো হয়ে থাকে। তাঁদেরকে জীবিতদের আমলনামা দেখানো হতো না, যদি তাঁরা দর্শন ক্ষমতাসম্পন্ন না হতেন, কারণ এটা পরিস্ফুট যে, তাঁদেরকে আমলনামা প্রদর্শন করা হয়' এর অর্থ হচ্ছে, কাঁধে অবস্থিত কিরামান-কাতেবীন ফেরেশতাগণ যেই স্থানে নথিভুক্ত করেন, সেই স্থান তাঁদেরকে প্রদর্শন করানো হয়। আর এতেই প্রতীয়মান হয় যে, মৃতজন দেখতে পান। মৃতজন দর্শন করতে পারেন—এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করার পর আমরা এখন সেই সব হাদীস উদ্ধৃত করা যথার্থ মনে করি, যেগুলোতে প্রমাণিত হয় যে, জীবিত মানুষদের আমলনামা মৃতজনদের দেখানো হয়।

ওয়াহাবীরা এ সব ব্যাখ্যা উপলব্ধি করতে অক্ষম। এর কারণ হচ্ছে তারা এ বিষয়ে নবী-এ মকবুল (সঃ)-এর সুন্নাত ও হাদীসসমূহ শুনেনি। এ সকল লোকেরা, যারা নিজেদেরকে আলিম মনে করে থাকে, তারা এতই অজ্ঞ যে, তারা প্রশ্ন করে থাকে, 'তাঁদের মাযার যিয়ারত করে শাফায়াত ও সাহায্য প্রার্থনাকারীদিগকে কিভাবে নবী ওয়ালিগণ চিনতে পারেন?' আমরা বলি, 'ঐ সকল মহান ব্যক্তিদেরকে বহু জিনিস সম্পর্কে জ্ঞাত করা হয়েছে। তাঁদের ওফাতের পরে কেন তাঁদেরকে জানানো হবে না?' অথবা আমরা তাদেরকে বলতে পারি, 'আল্লাহ্র স্বাভাবিক রীতি-বহির্ভূত দয়া ও নিয়ামতে নবী-ওয়ালিগণ শ্রবণ এবং দর্শন করতে পারেন।' হাদীসসমূহে ব্যক্ত হয়েছে যে, জীবিত ব্যক্তিদের আমলনামা মৃতজনদের দেখানো হয়। আমরা সেসব হাদীস, বিষয়টিকে অবিশ্বাসকারীদের জ্ঞাতার্থে পেশ করেছি। যদি কোন ব্যক্তি হাদীসগুলো পড়ার পর না বুঝে বলে ফেলে, "মৃতজন শুধুমাত্র তাঁদের পরিচিত লোকদেরকে চিনতে এবং শুনতে পারেন," তবে আমরা বলব, ''হাদীসগুলো পরিচিত ও অপরিচিতদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে না।" ওয়াহাবীরা একগুঁয়ে আচরণ করে থাকে। মৃত্যুর পর এ সত্যটি তাদের উপর নিপতিত হওয়ার পরই তারা বিশ্বাস করবে।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

اِسْتَبْشَرُوْا بِهٖ وَاِنْ كَانَ غَيْرَ ذَالِكَ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ لَا تُمِتْهُمْ حَتّٰى تَهْدِيَهُمْ كَمَا هَدَيْتَنَا ـ

অর্থাৎ "তোমাদের আমলসমূহকে তোমাদের মৃত আত্মীয় ও পরিচিতদের কাছে দেখানো হয়। তারা তোমাদের নেক আমল দেখলে আনন্দিত হয়। আর খারাপ আমল দেখলে তারা বলে ঃ 'ইয়া আল্লাহ্! তাদেরকে সঠিক পথপ্রাপ্তিতে সাহায্য করুন, যেমনিভাবে সাহায্য করেছিলেন আমাদেরকে। এর পর তাদের রূহ কবজ করুন (হাদীস)।" এ হাদীসটি রেওয়ায়াত করেছেন ইমাম আহ্মদ বিন হাম্বল, হাকিম আত্ তিরমিযী তাঁর 'নওয়াদিরুল উসুল' পুস্তকে এবং প্রখ্যাত আলিম আল-হাদীস মুহাম্মদ বিন ইস্হাক বিন মানদা। মহান মুহাদ্দিস সুলায়মান আবু দাউদ আত্ তায়্যালিসী, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রিওয়ায়াত করেন— হুযুর (সঃ)-এর হাদীস ঃ

اِنَّ اَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلٰى عَشَائِرِكُمْ وَاَقَارِبِكُمْ فِىْ قُبُوْرِهِمْ فَاِنْ كَانَ خَيْرًا اِسْتَبْشَرُوْا بِهٖ وَاِنْ كَانَ غَيْرَ ذَالِكَ قَالُوْا اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْهُمْ اَنْ يَعْمَلُوْا بِطَاعَتِكَ ـ

অর্থাৎ "তোমাদের আমলকে তোমাদের মৃত আত্মীয়-স্বজন এবং পরিচিতদের কাছে দেখানো হয়। যদি তোমাদের আমল নেক হয়, তবে তারা খুশি হয়। আর যদি তা না হয়, তবে তারা বলে ঃ 'ইয়া আল্লাহ্!

এমন বহু হাদীস আছে যেগুলোতে ব্যক্ত হয় যে, হুযুর পাক (সঃ)-এর কাছে উম্মতের আমলনামা দেখানো হয়। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্উদের উদ্ধৃতি দিয়ে বাযায একটা হাদীস বর্ণনা করেন ঃ

حَيَاتِىْ خَيْرٌ لَكُمْ تُحَدِّثُوْنَ وَيُحَدَّثُ لَكُمْ فَاِذَا اَنَا مِتُّ كَانَتْ وَفَاتِىْ خَيْرًا لَكُمْ تُعْرَضُ عَلَىَّ اَعْمَالُكُمْ فَاِنْ رَاَيْتُ خَيْرًا حَمِدْتُ اللّٰهَ وَاِنْ رَاَيْتُ شَرًّا اِسْتَغْفَرْتُ لَكُمْ ـ

অর্থাৎ, "আমার জীবন তোমাদের জন্য উপকারী; তোমরা তা বলবে এবং তোমাদেরকে তা বলা হবে। আমার মৃত্যুও তোমাদের জন্য উপকারী; তোমাদের আমল আমাকে দেখানো হবে। তোমাদের নেক আমল দেখলে আমি আল্লাহ্র প্রশংসা করি। আর বদ আমল দেখলে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি (আল-হাদীস)। হাদীসটির রিওয়ায়াত হয়েছে, "আমি রসুলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি" বাক্য দ্বারা সমর্থনের পর। আরও বহু আস্থাশীল ব্যক্তি এ হাদীসটিকে 'মুরসাল' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর যে হাদীসটা জীবিত ব্যক্তির আমলনামা তার পরিচিত মৃতজনের কাছে প্রদর্শন সম্পর্কে বর্ণনা দেয়, সেটা ঘোষণা করে ঃ

اِنَّ اَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلٰى اَقَارِبِكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ مِنَ الْاَمْوَاتِ فَاِنْ رَاَوْا خَيْرًا

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তাদের কলবসমূহকে উত্তম কাজে অনুপ্রাণিত করুন (আল-হাদীস)।" ইবনে আবি শায়বা তাঁর আল মুসান্নাফ গ্রন্থে আল হাকিম আত্‌তিরমিযী এবং ইবনে আবিদ দুনইয়া হযরত ইবরাহীম ইবনে মায়সারা থেকে বর্ণনা করেন যে হযরত আবু আইয়ুব আল আনসারী যখন কনস্টানটিনোপল (আধুনিক ইস্তাম্বুল) গমন করেন জিহাদের উদ্দেশ্যে, তখন তিনি একজন পথচারীকে বলতে শুনেন, "দুপুরে কৃত কর্মসমূহ বিকেলে মৃতজনদের প্রদর্শন করা হয়। আর বিকেলে সংঘটিত কর্মসমূহ দেখানো হয় সকালে।" হযরত আবু আইয়ুব তাঁকে প্রশ্ন করেন, "আপনি কি বলছেন?" উত্তরে পথচারী বললেন, "আল্লাহ্‌র নামে বলছি, এটা আপনার জন্যই বলেছি!" এর পর হযরত আবু আইয়ুব প্রার্থনা করেন, "ইয়া আল্লাহ্, আমি আপনার মাঝে আশ্রয় নিচ্ছি। উবাদা বিন সামিত এবং সাদ ইবনে উবাদার (কবরের) কাছে তাঁদের মৃত্যুর পর আমি যা করেছি তার জন্য আমাকে আপনি অভিশপ্ত করবেন না।" পথচারী বললেন, "আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের দোষ-ত্রুটি গোপন করে রাখেন; তিনি তাদের নেক আমল প্রদর্শিত হওয়ার সুযোগ দেন।" আল-হাকিম আত্‌তিরমিযীর 'নওয়াদির' কিতাবে লিপিবদ্ধ একটা হাদীস ইরশাদ ফরমান ঃ

تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ عَلَى اللهِ وَتُعْرَضُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ وَعَلَى الْاَوْلِيَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَفْرَحُوْنَ بِحَسَنَاتِهِمْ وَتَزْدَادُ وُجُوْهُهُمْ بَيَاضًا وَاِشْرَاقًا فَاتَّقُوا اللهَ وَلَا تُؤْذُوْا مَوْتَاكُمْ -

অর্থাৎ "আদম সন্তানদের আমলনামা আল্লাহ্‌র সামনে পেশ করা হয় প্রত্যেক সোমবার এবং বৃহস্পতি বারে। আর নবীগণ, আউলিয়া ও অভিভাবকদের সামনে পেশ করা হয় প্রত্যেক শুক্রবারে। নেক আমল দর্শনে তাঁরা আনন্দিত হন। তাঁদের মুখমণ্ডল আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠে। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। মৃতজনদের আঘাত দিও না" (আল-হাদীস)। মনুষ্য জাতির আমলনামা তাদের অপরিচিত মৃতজনদেরও দেখানো হয়ে থাকে। আবু আইয়ুব আল আনসারী (রাঃ) থেকে গ্রহণ করে আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক এবং ইবনে আবিদ দুনইয়া রিওয়ায়াত করেন নবীজী (সঃ)-এর হাদীস ঃ

تُعْرَضُ اَعْمَالُكُمْ عَلَى الْمَوْتٰى فَاِنْ رَاَوْ حَسَنًا اِسْتَبْشَرُوْا وَاِنْ رَاَوْ سُوْءًا......

অর্থাৎ "তোমাদের আমলকে মৃতদের জ্ঞাত করানো হয়। তোমাদের নেক আমল দর্শনে তারা আনন্দিত হয়। আর ব্যথিত হয় বদ আমল দর্শনে" (আল-হাদীস)। আরেকটা হাদীস ঘোষণা করে ঃ

اِتَّقُوا اللهَ فِىْ اِخْوَانِكُمْ مِنْ اَهْلِ الْقُبُوْرِ فَاِنَّ اَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيْهِمْ -

অর্থাৎ, "তোমাদের কবরস্থ ভ্রাতাদের জন্য আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তাদেরকে তোমাদের আমলনামা প্রদর্শন করা হয়" (হাদীস)। হাদীসটি রিওয়ায়াত

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

করেছেন আল হাকিম-আত্‌তিরমিযী, ইবনে আবিদ দুন্‌ইয়া এবং নুমান বিন বশীর থেকে গ্রহণ করে আল-বায়হাকী তাঁর 'শুআবুল ঈমান' গ্রন্থে। এই দুটো হাদীস সকল মৃতজনকে বুঝিয়েছে। হযরত আবুদ্‌ দারদা বলেন, "তোমাদের আমল মৃতজন-দের দেখানো হয়। সেটা দর্শন করে তাঁরা আনন্দিত অথবা ব্যথিত হন।" ইবনুল কাইয়েম আল-জাওযিয়া তার 'কিতাবুর রূহ' গ্রন্থে ইবনে আবিদ্‌ দুন্‌ইয়া থেকে উদ্ধৃত করে সাদাকা বিন সুলায়মান আল জাফরীর কথা—"আমি একজন বদ অভ্যাস যুক্ত লোক ছিলাম। আমার পিতার মৃত্যুর পর তা আমি সংশোধন করে ফেলি। উচ্ছৃংখলতা বর্জন করে ফেলি সম্পূর্ণভাবে। কিন্তু একবার আমি একটা দোষ করি। এর পর আমার পিতাকে স্বপ্নে বলতে দেখি ঃ 'হে পুত্র! তোমার নেক আমল নিয়ে আমি কবরে শান্তিতে ছিলাম। তুমি যা কর, তা আমাদের দেখানো হয়। তোমার আমল সুলাহাদের আমলের মতই ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে তুমি যা করেছ, তার জন্য আমি ব্যথিত এবং লজ্জিত। আশেপাশের মৃতজনের মাঝে আর আমাকে লজ্জা দিও না।" এই খবর প্রমাণ করে যে, অপরিচিত মৃতজনও দুনিয়াতে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। কারণ, পিতার কাছে প্রদর্শিত পুত্রের আমলনামা সম্পর্কে উল্লেখ করে পিতা বলেন, "আশে পাশে অবস্থিত মৃতজনদের কাছে আর আমাকে লজ্জিত করো না।" তিনি এ কথা বলতেন না, যদি অপরিচিত মৃতজন তাঁর সম্মুখে তাঁরই পুত্রের আমল নামা প্রদর্শন সম্পর্কে বুঝতে না পারতেন। আমরা উপরে হযরত খালিদ ইবনে যাইদ আবু আইয়ুব আল-আনসারী রেওয়ায়াতকৃত হাদীসটিও বর্ণনা করেছি, যাতে ব্যক্ত হয়েছে যে, দুনিয়াতে সংঘটিত সমস্ত আমল, পরিচিত কিংবা অপরিচিত সকল মৃতজনকে দেখানো হয়।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে যে, মৃতজন একে অপরের সাক্ষাৎ লাভ করেন, অর্থাৎ যিয়ারত করেন। হারিস ইবনে আবি উসামা, উবায়দুল্লাহ ইবনে সাইদ আল ওয়াযিলি তাঁর 'ইবানা' গ্রন্থে এবং জাবির ইবনে আবদুল্লাহ হতে আল উকাইলী একটি হাদীস বর্ণনা করেন, যেটা ঘোষণা করেন ঃ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اَحْسِنُوا اَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ فَاِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ
وَيَتَزَاوَرُوْنَ فِىْ قُبُوْرِهِمْ -

অর্থাৎ, "তোমাদের মৃতজনদের জন্য নিখুঁত কাফনের কাপড় ব্যবহার করবে! তারা তাদের কবর-সমূহে একে অপরের যিয়ারত করে এবং একে অপরের প্রশংসা করে" (আল-হাদীস)। সহীহ মুস্‌লিম শরীফের একটি হাদীস ঘোষণা করে ঃ

اِذَا وَلِىَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفْنَهُ -

অর্থাৎ "যারা তাদের ভাইদের দাফনের ব্যবস্থাদির দায়িত্বভার গ্রহণ করে, তারা যেন তাদের (মৃতজনদের) কাফনের কাপড় ভালভাবে তৈরী করে" (হাদীস)। যেহেতু মৃতজন একে অপরের যিয়ারত করে আত্ম-প্রশংসা করেন, সেহেতু একটি হাদীস ইরশাদ ফরমান ঃ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اَحْسِنُوا اَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ فَاِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُوْنَ
فِىْ اَكْفَانِهِمْ -

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অর্থাৎ "তোমাদের মৃতদের কাফনের কাপড় সুন্দরভাবে তৈরী করবে। কারণ তারা কাফনের কাপর পরে একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে" (হাদীস) হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন আবু হুরায়রা। আত্ তিরমিযী, ইবনে মাজা, মুহম্মদ ইবনে ইহ্ইয়া আল হামদানী তাঁর 'সহীহ্ গ্রন্থে এবং ইবনে আবিদ দুন্ইয়া এবং আবু কাতাদা হতে আল-বায়হাকী তাঁর 'শুআবুল ঈমান' পুস্তকে একটি হাদীস রেওয়ায়াত করেন ঃ

اذا ولى احدكم اخاه فليحسن كفنه

فانهم يتزاورون فى قبورهم -

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দাফন কার্য সমাধা করে, তার উচিত উত্তম কাপড় থেকে কাফন বস্ত্র তৈরী করা! কারণ কবরে তারা একে অপরের যিয়ারত করে" (হাদীস)। ইবনে তাইমিয়া তাঁর ফাতওয়াসমূহের বিভিন্ন অংশে বলে, "মৃতজন একে অপরের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন; তাদের সমাধি যে শহরগুলোতে অবস্থিত, সেগুলোর দূরত্ব যতটুকুই হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। দূরবর্তী শহরসমূহে কবরস্থ মৃতজন একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।" হানাফী উলামা ই কিরাম ফিকাহ্র কিতাবসমূহে লিখেছেন যে, কাফনের বস্ত্র সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেহেতু মৃতজন তাঁদের যা আছে তা নিয়ে গর্ব অনুভব করেন এবং যেহেতু তাঁরা একে অপরের যিয়ারত করেন। বস্তুত সকল মযহাবের উলামাই এ কথা লিখেছেন তাঁদের ফিকাহর পুস্তকগুলোতে। এ বিষয়টির সমর্থনে বহু অত্যাশ্চর্য ঘটনা এবং খবর বর্ণনা করা হয়েছে। যাঁরা এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে চান, তাঁরা দয়া করে মহান মুহাদ্দিস হযরত আস সুয়ুতীর গ্রন্থ 'শরহ্-এ-সুদুর' পড়তে পারেন।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ মৃতজন, প্রদর্শন ব্যতিরেকেই পৃথিবীতে জীবিতদের কাজ-কারবার সম্পর্কে জানতে পারেন। ইবনুল কাইয়েম আল জাওযিয়া, যাকে ওয়াহাবীরা একজন আল্লামা নামে সম্বোধন করে এবং যাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে, সে তার 'কিতাবুর রূহ্' গ্রন্থে লিখেছে ঃ "(মুহাদ্দীস) হাফেয আবু মুহাম্মদ আবদুল হাক্ক আল আশবিলী এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। জীবিত লোকদের আমল সম্পর্কে মৃতজন প্রশ্ন করেন এবং জীবিতদের কথা ও কাজ সম্পর্কে বুঝতে পারেন।" পরবর্তী পৃষ্ঠায়ই সে আমর ইবনে দিনারের কথা উদ্ধৃত করে ঃ "একজন ব্যক্তি তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে সংঘটিত পরিবর্তন সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তিনি তাদেরকে দেখেন, যারা তাঁর লাশকে গোসল দেয় এবং কাফনের কাপড় পরায়।" পরবর্তী পৃষ্ঠায় ইবনুল কাইয়েম আল-জাওযিয়া আরও লিখে, "সাব ইবনে জুসামা এবং আউফ ইবনে মালিক পরবর্তী জগতে একে অপরকে ভ্রাতা হিসাবে সাব্যস্ত করেন। তাঁরা একমত হন যে, যিনি আগে মারা যাবেন, তিনি অপরজনকে স্বপ্নে দেখা দেবেন। সাব আগে মারা যান এবং আউফকে স্বপ্নে দেখা দেন। আউফ জিজ্ঞাসা করেন, 'আল্লাহ্ তোমার ব্যাপারে কি করেছেন?' সাব উত্তর দেন, 'তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।' কথোপকথনের শেষে সাব বলেন, 'আমার পরিচিতদের আমল সম্পর্কে আমাকে এমনই সম্যক অবহিত করানো হচ্ছে যে, উদাহরণস্বরূপ, আমি এখন জানি যে তোমার বিড়ালটা মারা গিয়েছে...কিছুদিন আগে। আমার কন্যা ছয় দিন পর মারা যাবে। তার পরে তুমিই জিম্মাদার হয়ো।' তিনি যেভাবে স্বপ্নে বলেছিলেন, ঠিক সেভাবে ঘটনাটা ঘটে।" এর পর ইবনুল কাইয়েম বর্ণনা দেয়—হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের সৈন্যদের মধ্যে একজনের স্বপ্নে সাবিত বিন কায়েসের আগমন এবং সম্ভাষণ ঃ "খালিদ বিন

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ওয়ালীদের কাছে যেয়ে বল যে আমার শাহাদাৎ প্রাপ্তির পর একজন মুসলিম সৈন্য আমার দেহ থেকে লৌহ বর্মটি খুলে নিয়ে যায়। তার তাঁবুটি শিবিরের অপর প্রান্তে অবস্থিত। সেটার কাছে একটা লম্বা রশি বাঁধা ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছে। তিনি (খালিদ) যেন লৌহ বর্মটি সৈন্যটির কাছ থেকে নিয়ে নেন।" ইবনে কাইয়েম বলে, "সৈন্যটি খালিদ (রাঃ)-কে তাঁর স্বপ্ন সম্পর্কে জানায়। তাঁরা উক্ত তাঁবুতে গমন করেন এবং লৌহ বর্মটি পান।" (কিতাবুর রূহ)

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ইমাম আস সুয়ূতী তাঁর 'শরহ্-এ সুদূর' কিতাবে হযরত আদ্ দায়লামী বর্ণিত একটা হাদীসের উদ্ধৃতি দেন, যিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)এর কাছ থেকে তা রিওয়ায়াত করেন। হাদীসটির বিষয়বস্তু হচ্ছে মৃত ব্যক্তি জীবিতদের (অশুভ) খবরাখবর জেনে ব্যথিত হনঃ

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْمَيِّتَ يُؤْذِيْهِ فِيْ قَبْرِهِ مَا يُؤْذِيْهِ فِيْ بَيْتِهِ ـ

অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তি (জীবিতাবস্থায়) তার ঘরে থাকাকালীন যে জিনিস দ্বারা ব্যথিত হতো, কবরেও তা দ্বারা সে ব্যথিত বা মর্মাহত হবে" (হাদীস)। 'আত-তাযকিরা' কিতাবে ইমাম আল-কুরতুবী বলেন, "আল্লাহ্ তায়ালা জীবিত লোকদের আমল কোন ফেরেশতা কিংবা ইঙ্গিত অথবা অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে মৃত-জনদের কাছে জ্ঞাত করান।" ইবনুল কাইয়েম আল জাওযিয়া তার 'কিতাবুর রূহ্' পুস্তকে বলে, "মৃত-জনের রূহ্ যে জীবিতদের রূহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার একটি প্রমাণ হচ্ছে এই যে, জীবিত ব্যক্তিগণ মৃতজনদেরকে স্বপ্নে দেখেন এবং তাঁদেরকে প্রশ্ন করেন। মৃতজন তাদেরকে এমন জিনিস জানাতে পারেন, যা জীবিতরা জানত না। অতীত এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের উত্তরসমূহ সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁদের জীবদ্দশায় তাঁরা যে সব জায়গায় তাঁদের কোন জিনিসপত্র পুঁতে রেখে কাউকে সে কথা জানান নি, সে কথা তাঁরা অনেক সময় বলে থাকেন। এটা অহরহ পরিদৃষ্ট হয়েছে যে, মৃতজন জীবিত থাকাকালীন তাঁদের কাছে দেনাগ্রস্ত ব্যক্তিদের দেনা সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন এবং উক্ত দেনা পাওনার সাক্ষীদের সম্পর্কেও বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁরা বহুবার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁদের জীবদ্দশায় সংঘটিত গোপনীয় কাজ সম্পর্কে, যেগুলো ছিল সবার অজ্ঞাত এবং যেগুলো তাঁদের কথানুযায়ী পরবর্তীকালে সত্যে পরিণত হয়েছে। আরেকটি অলৌকিক বিষয় হচ্ছে এই যে, মৃতজন যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু দিবস সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছেন, তখন সেই ব্যক্তির মৃত্যু ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী উক্ত নির্দিষ্ট দিনেই সংঘটিত হয়েছে। আর এটাও বহুবার পরিদৃষ্ট হয়েছে যে, মৃতজন জীবিত কোন ব্যক্তির কোন গোপন কাজ সম্পর্কে অন্য কোন জীবিত ব্যক্তির কাছে জানিয়েছেন। সাব এবং সাবিত, যাঁদের সম্পর্কে উপরে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তাঁরা মৃত্যুবরণ করার পরও জীবিতদের সঙ্গে স্বপ্নে আলাপ করেছেন।" ইমাম সুয়ূতী তাঁর 'শরহ্-এ-সুদূর' গ্রন্থে মুহাম্মদ বিন সিরিনের কথা উদ্ধৃত করেনঃ "মৃতজন যা জ্ঞাত করান (স্বপ্নের মাধ্যমে বা অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে) তার সবটুকুই সত্য, কারণ তাঁরা এমন এক পৃথিবীতে আছেন, যেখানে কোন মিথ্যা অথবা ভ্রান্তি নেই। সেই আলম (জগতের)-এর মানুষগণ সব সময়েই সত্য কথা বলেন। আমাদের পর্যবেক্ষণ এবং উপলব্ধি আমাদের কথাকে সমর্থন দেয়।"

(ক্রমশঃ)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ওয়াহাবী মতবাদ খণ্ডনে ঐশী অবদান

গাযী সালাহ্উদ্দীন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সূফী মতবাদ

পরের দিন সকালে একজন লোক এসে আমাকে দুটো কবরের মধ্যখানে অরেকটা কবর খোঁড়ার জন্য বলে। সে ঐ দুটো কবরের দিকে ইশারা করে দেখাচ্ছিল, যেখান থেকে আমি আগের রাতে বাক্যালাপ শুনেছিলাম, তাকে আমি জিজ্ঞাসা করি : এ দুটো কবরের বাসিন্দাদের নাম কি ? সে উত্তর দেয় : 'এটা জাবির আর এটা আবদুল্লা।' আমি এর পর তাকে সমস্ত ঘটনা জানাই। ব্যক্তিটির উত্তর : হ্যাঁ এ কথা সত্য যে তার জন্য দোয়া না করতে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। কিন্তু এখন আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে সেটার জন্য কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) করব।"

সপ্তম অধ্যায় : নির্ভরযোগ্য কিতাবাদিতে লিপিবদ্ধ আছে যে, মহান আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে মৃতজন কাজ (তাসাররুফ) করে থাকেন এবং তাঁদের কাছ থেকে বহু কিছু প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। হাদীস আলিম আস-সুয়ূতী তাঁর 'আল-মুতোকাদ্দিম' কিতাবে এবং হাফেয ইবনে হাজর তাঁর ফাতওয়াসমূহে বলেন, মুমিনদের রূহসমূহ 'ইল্লিয়ীন' এবং কাফিরদের রূহসমূহ 'সিজ্জিন' নামক মাকাম (স্থান, পর্যায়) এ অবস্থান করে প্রত্যেক রূহ্ই তার দেহের সঙ্গে অজ্ঞাত একটা বন্ধনে আবদ্ধ। এই সংশ্লিষ্টতা দুনিয়াবী কোন সম্পর্ক নয়। এ সম্পর্ক অনেকটা ব্যক্তির স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয়ের সঙ্গে তার সম্পৃক্ততার মতই। কিন্তু জীবিত লোকদের স্বপ্নে দৃষ্ট বিষয়ের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততার তীব্রতা অপেক্ষা মৃতজনের নিজেদের দেহ এবং অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার তীব্রতা অনেক বেশী। অতএব, ইবনে আবদুল বারের মন্তব্য—রূহসমূহ তাদের কবরের সাথেই বিরাজমান—এর সঙ্গে উপরোক্ত ব্যাখ্যাসমূহের একটা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা মোটেও দুষ্কর নয়। রূহসমূহকে তাসির (প্রভাব বিস্তার, পরিচালনা) করার অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং তাঁদের দেহ তাঁদের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। আর তাঁরা তাঁদের কবরে হাযির (উপস্থিত) আছেন। যদি কোন লাশ কবর থেকে উত্থিত করে অন্য আরেক স্থানে কবর দেয়া হয়, তাতেও দেহের সঙ্গে রূহের সম্পৃক্ততার কোন বিচ্যুতি ঘটবে না। এই সম্পর্ক ভঙ্গ হবে না—যদি দেহের জৈবিক পদার্থসমূহের ক্ষয় সাধিত হয়ে সম্পূর্ণ দেহ মাটিতে পরিণত হয়, তবুও সম্পর্ক ভাঙ্গবে না।" ইমাম আস্সুয়ূতী বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস হতে ইবনে আসাকির যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তা পরিস্ফুট করে যে রূহসমূহ ইল্লিয়ীন-এ থেকেও তাঁদের সঙ্গে সংযুক্ত এবং তাঁরা তাঁদের দেহকে ব্যবহার করার অনুমতি প্রাপ্ত। হুযুর পুর নূর (সঃ) ইরশাদ করেন :

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم
قال بعد قتل جعفر لقد مر بى الليلة
جعفر يقتفى نفرا من الملائكة له جنا
حان مختضبة قوادمهما بالدم يريدون
بيشة بلدا باليمن ـ

অর্থাৎ 'এক রাতে জাফর তাইয়ার আমার কাছে আসে। তার সঙ্গে একদল ফেরেশতা ছিল। জাফরের দুটো পাখা ছিল, যার উভয় প্রান্তভাগ ছিল রক্তাক্ত। তারা ইয়েমেনের বিশা নামক পল্লীতে যাচ্ছিল। জাফর তাইয়ারের শাহাদাৎ প্রাপ্তির পর তিনি একথা বলেন। একটা হাদীসে ঘোষিত হয়েছে :

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

قَالَ عَرَفْتُ جَعْفَرَ فِي رَفْقَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُبَشِّرُونَ أَهْلَ بِيشَةَ بِالْمَطَرِ-

অর্থাৎ, আমি জাফর ইবনে আবি তালিবকে ফেরেশতাদের সঙ্গে দেখলাম। তারা বিশা-এর অধিবাসীদের কাছে সমাগত বৃষ্টির সংবাদ প্রদান করছিল (আল হাদীস)। হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব হতে ইবনে আদি। হাদীস-এর আলিম হাকিমের বর্ণনা অনুসারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন যে, তিনি হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর পাশে বসেছিলেন এবং সেখানে আসমা বিনতে উনাইসও উপস্থিত ছিলেন; হুযুর (সঃ) 'আলাইকুম সালাম' বলার পর বলেন—হে আসমা! কিছুক্ষণ আগে তোমার স্বামী জাফর জিবরীল (আঃ) ওমিকাইল-এর সঙ্গে আমার কাছে এসেছিল। তারা আমাকে সালাম জানায়। আমিও তার প্রত্যুত্তর দিই। এর পর জাফর বলেঃ "মূতা-র যুদ্ধে আমি কিছুদিন কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ করি। আমার দেহের তিয়াত্তরটি অংশে আমি আহত হই। ডান হাতে পতাকা ধরে রাখি। তখন ডান হাত (কাফিররা) কেটে ফেলে। বাম হাতে পতাকা ধরবার পর সেটাও কেটে ফেলা হয়। আল্লাহ আমাকে দুটো হাতের পরিবর্তে দুটো পাখা দিয়েছেন। জিবরীল ও মিকাইলের সঙ্গে আমি উড়ি। যখন ইচ্ছা তখনই বেহেশত থেকে উড়ে বেরিয়ে যেতে পারি। আবার ভিতরে গিয়ে ওর ফলসমূহ ভক্ষণ করতে পারি যখন ইচ্ছা তখন।" আসমা বললেন, 'আল্লাহ্ জাফরের মঙ্গল করুন। কিন্তু আমি ভীত যে, মানুষ এ কথা শ্রবণে বিশ্বাস করবে না। আপনি কি তাদেরকে মিম্বরে উঠে এ কথা বলবেন! তারা আপনাকে বিশ্বাস করবে।' রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মসজিদে তশরীফ নিয়ে মিম্বরে আরোহণ করেন এবং আল্লাহ্র হামদ পাঠ করে বলেন ঃ জাফর ইবনে আবি তালিব আমার কাছে এসেছিল জিবরীল ও মিকাইলের সঙ্গে। আল্লাহ্ তাকে দুটো পাখা মঞ্জুর করেছেন। সে আমাকে সালাম দিয়েছিল'[১] (আল-হাদীস)। এর পর তিনি আসমাকে তাঁর স্বামী সম্পর্কে পূর্বে যা বলেছিলেন তা আবার দু'বার বর্ণনা করেন" (ইমাম সুয়ূতী)। এ সকল হাদীস থেকে প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ্ তাঁর শহীদ ও সালেহ বান্দাদেরকে মানুষের উপকারার্থে কর্ম সংঘটনের অনুমতি প্রদান করেছেন। হাদীস উলামা এ বিষয়টির সমর্থনে বহু তথ্য রিওয়ায়াত করে অজস্র নিবন্ধ লিখেছেন। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী এ রকম একটা রিওয়ায়াত করেছেনঃ 'ইবনে আবিদ্দুনইয়া বলেন—'আবু আবদুল্লাহ শামী বাইজেনটাইনীয়দের সঙ্গে জিহাদ করতে যান। তাঁরা শত্রুপক্ষদের পিছু ধাওয়া করেন। দুইজন সৈন্য মূল মুসলিম বাহিনী থেকে বিচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়। তাদের একজন

১. عن بن عباس قال بينما النبى صلى الله عليه و سلم جالسا و اسماء بنت عميس قريبا منه اذ رد السلام و قال يا اسماء هذا جعفر مع جبرئيل و ميكائيل مروا فسلموا علينا و اخبرلى انه لقى الشركين يوم كذا و يوم كذا قال فاصبت فى جسدى من مقادمى ثلاثا و سبعين من طعنة و ضربة ثم اخذت اللواء بيدى اليمنى فقطعت ثم اخذ له بيدى اليسرى فقطعت فعوضنى الله من يدى جناحين اطير بهما مع جبرئيل و ميكائيل انزل من الجنة حيث شئت و اكل من ثمارها ما شئت قالت اسماء هنيئا لجعفر مارزقه الله من الخير لكنى اخاف ان لا يصدقنى الناس فاصعد المنبر فاخبر به الناس فصعد المنبر احمد الله و اثنى عليه ثم قال ان جعفر ابن ابى طالب مر مع جبرئيل و ميكائيل عوضه الله من يديه جناحين فسلم على ثم اخبر هم بما اخبره به -

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

বর্ণনা করে : "আমরা (উক্ত সৈন্যদ্বয়) শত্রু প্রধানকে দেখতে পেয়ে তাকে আক্রমণ করি। দীর্ঘ সময় আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হই। আমার বন্ধু শহীদ হন। আমি যুদ্ধ বন্ধ করে পিছটান দিই এবং সহযোদ্ধাদের খোঁজ করি। এর পর নিজ মনে বলি, লজ্জা আমার উপর! কেন পলায়ন করছি? পুনরায় আমি যুদ্ধে ফিরে যাই এবং শত্রু প্রধানকে আক্রমণ করি। আমার তরবারির আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। শত্রু প্রধান আমাকে আক্রমণ করে এবং ধরাশায়ী করে। এর পর সে আমার বুকের উপর চড়ে বসে। আমাকে হত্যা করার জন্য সে কিছু একটা হাতে নেয়ার চেষ্টা করতে থাকে। এমন সময় আমার শহীদ বন্ধুটি লাফিয়ে উঠে শত্রুর চুল ধরে পিছন দিকে টান দেয়। আমরা এক সঙ্গে কাফিরটির প্রাণ সংহার করি। বাক্যালাপে রত হয়ে আমরা একটা দূরবর্তী গাছের কাছে হেঁটে যাই, সেখানে যাওয়ার পর আমার বন্ধু পুনরায় সরে পড়ে থাকে। আমি আমার মুসলিম ভ্রাতাদের কাছে এসে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বলি' (ইবনে আবিদ্ দুনইয়ার কথার উদ্ধৃতি এখানে শেষ হলো)। 'রওদাতুল আখইয়ার' গ্রন্থের লেখক হানাফী আলিম যানদুসী এবং 'যুবদাতুলকাফুহা' পুস্তকের লেখকও এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হাদীস আলিম আল-মাহামিলি তাঁর 'আল আমালীউল ইসফাহানিয়্যা' পুস্তকে আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহর কথা উদ্ধৃত করেন : 'আমরা জনৈক বন্ধুর সঙ্গে দামেশকে অবস্থান করছিলাম। তার স্ত্রীও তার সঙ্গে ছিল। আমি ইতিমধ্যেই জানতাম যে তাদের পুত্র শহীদ হয়েছে। একজন অশ্বারোহী আমাদের কাছে আসে। আমার বন্ধু তাকে স্বাগত জানায়। এর পর সে তার স্ত্রীকে বললো : "এটা আমাদের পুত্র!' তার স্ত্রী তাকে বললো : 'শয়তান তোমার থেকে দূর হোক! তুমি কি জানো না যে আমাদের পুত্র বহু আগেই শহীদ হয়েছে?" বন্ধুটি নিজের উক্তির জন্য অনুতপ্ত হলো। কিন্তু সে অশ্বারোহীর কাছে গিয়ে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে বলে উঠল : 'আল্লাহর কসম! এটা আমাদেরই পুত্র! মহিলাটিও অবলোকন করে চিৎকার করে উঠল : "আল্লাহর কসম! এই তো সে!' আমার বন্ধু অশ্বারোহীকে জিজ্ঞাসা করল : "তুমি তো শাহাদাৎ প্রাপ্ত হয়েছ, তাই না পুত্র?" অশ্বারোহী বললো : 'হ্যা পিতা। কিন্তু উমর ইবনে আবদুল আযীয এই মাত্র মারা গিয়েছেন। আমরা শহীদরা আল্লাহর কাছে তাঁর যিয়ারতের অনুমতি চাই। আমি আপনাকে সালাম জানানোর অনুমতিও প্রার্থনা করি।" এর পর অশ্বারোহী বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে প্রস্থান করে। সহসা শ্রুত হলো যে, উমর বিন আবদুল আযীয ইন্তেকাল করেছেন।' আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহর কথার উদ্ধৃতি এখানে শেষ হলো" (ইমাম সুয়ূতী)। ইমাম সুয়ূতী আরো বলেন, "এসব বর্ণনা সহীহ এবং সত্য। হাদীস উলামা এগুলোকে সমর্থনকারী দলিলাদিসহ লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম অল ইয়াকী-ই সর্বশেষটি লিখেছেন। আমি তাঁর লেখনীকে সমর্থন দেয়ার জন্য পুনরায় লিখলাম।" আস-সুয়ূতীর কিতাবে এ ধরনের বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে। যাঁরা আরো পড়তে চান, তাঁরা ঐ বইটি (শরহ-ই-সুদূর) পড়তে পারেন।

ইমাম আল ইয়াকী-ই বলেন, 'মৃতজনদেরকে শুভ অথবা অশুভ পরিস্থিতিতে দেখাটা হচ্ছে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের প্রতি প্রদত্ত তাঁরই দান, যা কারামত বা কাশফস্বরূপ তাঁরা পেয়ে থাকেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবিতদেরকে শুভ সংবাদ প্রদান, মৃতজনের পক্ষ থেকে উপদেশ বিতরণ এবং মৃতদের দেনা পরিশোধকরণ। মৃতজনদেরকে বেশীর ভাগ সময়ই স্বপ্নে দেখা যায়, তবু এমনও অনেক লোক আছেন, যাঁরা তাঁদেরকে জাগ্রতাবস্থায় দেখতে পান। এটা

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ওয়ালী-আল্লাহ্ এবং 'হাল' সম্পন্ন ব্যক্তিদের কারামত।" (ইমাম ইয়াকী-ই)। পুস্তকের অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "আহল-এ-সুন্নতের উলামা-ই-কিরাম বলেন যে, ইল্লিয়ীন ও সিজ্জিনে অবস্থিত মৃতজনদের রূহগুলোকে মাঝে-মধ্যে তাঁদের কবরস্থ দেহের কাছে ফেরত পাঠানো হয় অর্থাৎ আল্লাহ্‌র যখন ইচ্ছা, তখনই তা করা হয়। এটা শুক্রবার রাতেই বেশী করা হয়। মৃতজন পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন। যাঁরা বেহেশত্ পাওয়ার যোগ্য তাঁরা নিয়ামত লাভ করেন। আর যারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য তারা তা পায়। যদিও রূহসমূহের দেহগুলো তাঁদের সঙ্গে থাকে না, তবুও তাঁদের উপর ইল্লিয়ীনে শান্তি এবং সিজ্জিনে শাস্তি আপতিত হয়। আর কবরের বিষয়টির ক্ষেত্রে রূহ এবং দেহ উভয়ের উপরই শান্তি অথবা শাস্তি দেয়া হয়।" 'কিতাবুর রূহ্' গ্রন্থে ইবনুল কাইয়্যেম আল-জাওযিয়া বলেন: "এ সকল ঘটনার ইতিবৃত্ত থেকে এ সিদ্ধান্তই টানা যায় যে, রূহের হাল বা অবস্থা তার শক্তি বা দুর্বলতা, মাহাত্ম্য কিংবা হীনতা দ্বারা প্রভাবিত। মহান আত্মাদের 'হাল' অন্যান্যদের মত নয়। এটা জ্ঞাত যে, পৃথিবীতে রূহসমূহের হাল বিভিন্ন, যা তাঁদের শক্তি বা দুর্বলতা অথবা গতির উপর নির্ভরশীল। যে রূহ্ দাসত্ব থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং তাঁর দেহের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ও মালিকানা বিচ্ছিন্ন করেছেন, সেই রূহ দেহের সঙ্গে বন্দী রূহের চাইতে আল্লাহ্ এবং বস্তুসমূহের ব্যাপারে একটা আলাদা শক্তি, প্রভাব, সাহায্য করার সামর্থ্য, গতি ও সম্পর্ক নিয়ে বিরাজ করে। রূহ নিজেই মহান, নির্মল এবং বিশাল সাহায্যের আধার। দেহ ত্যাগের পর পরই তিনি তাঁর গণ্ডি ছাড়িয়ে যান। তখন তিনি আরো বহু কিছু করতে পারেন। মৃতজনদের রূহসমূহকে স্বপ্নে দর্শন করা যায় এবং তাঁরা এমন সব অসাধারণ (অলৌকিক) কাজ করতে সক্ষম, যেগুলো তাঁদের দেহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার কারণে জীবদ্দশায় তাঁরা করতে পারেন না। এক, দুই কিংবা গুটি-কতক মানুষকে দেখা গিয়েছে বহুবার বিশাল সৈন্য বাহিনীকে পরাভূত করতে। রসূল-ই-আকরাম (সঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ) এবং হযরত উমর (রাঃ)-কে বহুবার স্বপ্নে দেখা গিয়েছে। আর তাঁদের রূহ মুবারক অবিশ্বাসী বাতিল সৈন্য-বাহিনীদের বিতাড়িত করেছেন বহুবার। আমরা এখানে যা লিখলাম, তা সূরা নাজিয়ার পঞ্চম আয়াতের উপর কৃত মুফাসসিরগণের তফসীরের সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণ; উদাহরণস্বরূপ, আল-বায়যাবীর তফসীর-দেহত্যাগের পর একজন ওয়ালীর রূহ ফেরেশতাদের জগতে গমন করেন। তারপর তিনি বেহেশতের বাগানে বিচরণ করতে যান। তিনি তাঁর দেহের সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় রাখেন এবং এর উপর প্রভাব বিস্তার করেন।' আল-বায়দাবীর উদ্ধৃতি এখানে শেষ হলো" (ইবনুল কাইয়্যেম কৃত কিতাবুর রূহ)।

অষ্টম অধ্যায়ঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সঃ) কর্তৃক এ কথা উন্মোচিত হয়েছে যে, জীবিতদের দ্বারা তাদের উপর আপতিত কবরের শান্তি অথবা শাস্তি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং তা চর্মচক্ষে দর্শন করা অনুমতিপ্রাপ্ত। আহল আস-সুন্নাতের উলামা সর্ব সম্মতভাবে রিওয়ায়াত করেন যে, কবরে শান্তি অথবা শাস্তি আছে এবং সেগুলোর দেহ ও রূহের উপর আপতিত হওয়ার বিষয়টিতে বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য। আকাইদের পুস্তকাদিতে এ বিষয়টির উপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। শুধুমাত্র মুতাযিলা এবং খারেজীরা কবর আযাবে বিশ্বাস করেনি। হাদীস-সমূহে এবং সাহাবা-ই-কিরামের আসারসমূহ (বাণী) এবং সালাফ আস-সালেহীনের লেখনী থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কবর আযাব রয়েছে। কিছু অজ্ঞ লোক এবং ওয়াহাবীরা এটাতে বিশ্বাস করে না, কারণ তারা এ সব দলিল সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের ঈমান দুর্

করার উদ্দেশ্যে এ সকল দলিল সম্পর্কে জানা দরকার,

আমরা উপরে উল্লেখ করেছি যে, নবীগণ তাঁদের কবর সমূহে আমাদের অজ্ঞাত একটা জীবনে জীবিত আছেন। আল-বুখারী এবং আল-মুসলিম রেওয়ায়াত করেন যে, নবীগণ ওফাতের পর হজ্জ সমাপন করেন ; আর নবী নন—এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে আবু নুয়াইম, হযরত সাবিত আল-বানানীর কথা উদ্ধৃত করেন—আমি হামিদ আত্ তাওয়িলকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ নবীগণই কি শুধু তাঁদের কবরগুলোতে সালাত আদায় করেন ? তিনি বলেন ঃ না, অন্যান্য ব্যক্তিও তা আদায় করতে সক্ষম। এর পর আমি বললাম ঃ হে আমার আল্লাহ ! যদি আপনি কখনো কোন ব্যক্তিকে তার কাছে সালাত পড়ার অনুমতি দেন, তবে এই সাবিতকেও তা দিবেন !" আবু নুয়াইম আরো বর্ণনা করেন ঃ 'যুবাইর বলেছেন 'আমি একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহুর কসম করে বলছি। আমি সাবিত-আল বানানীকে কবরে সমাহিত করি। হামিদ তাওয়িলও আমার সঙ্গে ছিলেন। আমরা তাঁকে (বানানী) মাটি দ্বারা দাফন করি। ঐ সময় এক প্রান্তের মাটি সরে যায়। আমি কবরের ভিতরে তাকিয়ে তাঁকে সালাত পড়তে দেখি।" ইবনে জাবির তাবারী তাঁর তাহযিবুল আসার' কিতাবে এবং আবু নুয়াইম ইবরাহীম বিন সাবিত হতে বর্ণনা করেন যে, প্রভাতকালে সাবিত আল-বানানীর কবরের পার্শ্ব দিয়ে যারা চলাচল করেছে, তারা বলেছে যে তারা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত শুনতে পেয়েছে। ইবনু জাওয়যীও তাঁর 'সিফাতুস সাফওয়া' গ্রন্থে এ কথা লিখেছে। তিরমিযী, হাকিম ও বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কথা রিওয়ায়াত করেন ঃ "কয়েকজন সাহাবী একটা জায়গায় তাঁবু খাটিয়েছিলেন, যেখানে একটা অজ্ঞাত কবর ছিল। তাঁরা তাঁবুর অভ্যন্তরে সুরা মুলক তিলাওয়াত শ্রবণ করেন। তিলাওয়াত সমাপ্ত হবার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করেন। যখন সাহাবাগণ তাঁকে ঘটনার বৃত্তান্ত সম্পর্কে অবহিত করেন, তখন হুযুর (সঃ) বলেন ঃ

هِيَ (سورة الملك) الْمُنْجِيَةُ تُنْجِي

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ-

অর্থাৎ "এই সম্মানিত সূরাটি মানুষকে কবর আযাব থেকে রক্ষা করে" (আল-হাদীস)। আবুল কাসিম সাদি তাঁর রচিত 'কিতাবুর রূহ' পুস্তকে লিখেছেন, "এ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মৃতজন তাঁদের কবরে কুরআন তিলাওয়াত করেন। আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)-ও একটা তাঁবু কোন এক জায়গায় স্থাপন করেছিলেন। তিনি তাবুর অভ্যন্তরে কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পান। এ কথা হুযুর পুর নুর (সঃ) কে জানানোর পর হুযুর(সঃ)তাঁর কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।" 'আহ্ওয়াল আল-কুবুর' কিতাবে মুহাদ্দিস যাইনুদ্দীন ইবনে রাজাব লিখেছেন ঃ "আল্লাহ তায়ালা নিয়ামতস্বরূপ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে তাদের কবর শরীফে সওয়াবদায়ক কাজ সংঘটনের সামর্থ্য দান করে থাকেন। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির ইবাদত সম্পাদনের দায়িত্ব সমাপ্ত হয়। কবরে সম্পাদিত ইবাদতে কোন লাভ নেই। (বিনিময়ে পুরস্কার নেই—অনুবাদক) কিন্তু মৃতজন আল্লাহুর যিকর ও ইবাদত করতে পারলে আনন্দ অনুভব করেন। ফেরেশতা ও বেহেশতী ব্যক্তিগণও তাই অনুভব করেন। তাঁরা ইবাদতে আনন্দ পান, কারণ যিকর এবং ইবাদত হচ্ছে সালেহ রূহগণের জন্য সবচেয়ে মধুর জিনিস। অসুস্থ, রূহসম্পন্ন ব্যক্তিরা এ আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না।" ইবনুল কাইয়েম আল-জাওযিয়া তার 'কিতাবুর রূহ গ্রন্থে শহর-ই-সুদূর' কিতাবে ইমাম সুয়ূতী এবং ইবনে তাইমিয়াসহ আরও বহু উলামা একই কথা লিখেছেন। আবুল হাসান ইবনে বারা তাঁর প্রণীত

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

'রাওযা পুস্তকে' লিখেছেন, 'ইবরাহীম নামক এক কবর খননকারী বলেছেন ঃ 'আমি একটি কবর খনন করি। সেটা থেকে আতরের সুগন্ধির ঘ্রাণ অনুভব করি এবং কয়েক টুকরা ইট দর্শন করি। আমি কবরের অভ্যন্তরে তাকিয়ে দেখি একজন বৃদ্ধ লোক কুরআন তিলাওয়াত করছেন।' মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে মানদা, আসিমা আস সাকাতী কথা উদ্ধৃত করেন ঃ আমরা বলল নগরীতে একটা কবর খনন করি। এতে পার্শ্ববর্তী কবরের অভ্যন্তর ভাগ দৃশ্যমান হয়। একজন সবুজ কাফনের কাপড় পরিহিত বৃদ্ধ কুরআন হাতে নিয়ে তিলাওয়াত করছিলেন। 'রাওযা' গ্রন্থটিতে এ ধরনের বহু ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হাদীস -এর আলিম আবু মুহাম্মদ হালাল তাঁর 'কারামাতুল আউলিয়া' পুস্তকে লিখেছেন যে, আবু ইউসুফ গাদুলী বলেছেন যে, তিনি হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামের সাক্ষাৎ লাভ করেন দামিশকে। হযরত ইবরাহীম আদহাম (রহঃ) বলেন ঃ 'আজ একটা অপূর্ব জিনিস দেখলাম।' আবু ইউসুফ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কি জিনিস? উত্তরে হযরত ইমাম বললেন ঃ ঐ কবরস্থানের একটা কবরের পাশে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। কবরটা খুলে যায়। একজন সবুজ কাফন পরিহিত বৃদ্ধ আগমন করলেন। তিনি বললেন ঃ 'হে ইবরাহীম! তোমার জন্য আল্লাহ্ আমাকে জীবিত করে দিয়েছেন। ইচ্ছানুযায়ী তুমি আমাকে যে কোন প্রশ্ন করতে পারো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম! আল্লাহ্ আপনার সঙ্গে কি রকম আচরণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন—'আমার বদ আমল আমাকে ঘিরে ফেলেছিল। কিন্তু আল্লাহ বললেন যে, তিনি তিনটি কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন ঃ যেহেতু আমি তাঁদেরকে ভালবেসেছি, যাঁদেরকে তিনি ভালবেসেছেন; যেহেতু এ পৃথিবীতে কোন মদ্য পান এ করিনি; এবং যেহেতু আমি তাঁর হুযুরে উপস্থিত হয়েছি আমার সাদা দাড়িসহ। তিনি ঘোষণা করলেন যে, তাঁর হুযুরে এ অবস্থায় আগমনকারী মুসলিমদেরকে শাস্তি দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। এর পর বৃদ্ধটি কবরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যান। ইবনুল জাওযী তাঁর কৃত 'সিফাতুস সাফওয়া' কিতাবে লিখেছেন ঃ উম্মুল আসওয়াদ তাঁর দুগ্ধ-মাতা মুয়াযার কথা উদ্ধৃত করেন—'আবুস সাহবা এবং আমার পুত্র শহীদ হওয়ার পর থেকে পৃথিবীটা আমার জন্য একটা কারাগার হয়ে গিয়েছে। আমি আর কিছুই উপভোগ করি না। তবুও আমি এই আশা নিয়ে বাঁচতে চাই যে, আমি এমন কিছু একটা করতে পারব, যার দরুন আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবো এবং ফলস্বরূপ আবুস সাহবা ও আমার পুত্রের সঙ্গে জান্নাতে মিলিত হতে পারব।' মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন বলেন যে, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে মুয়াযা ক্রন্দন করেন। এর পর তিনি হাসেন। এ রকম করার হেতু জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন ঃ '(মৃত্যুর ফলে) আমাকে সালাত, রোযা, কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহ্র নামের যিকর থেকে নিবৃত্ত করা হবে, একথা ভেবে চিন্তিত ছিলাম। তখন আমি আবুস সাহবাকে দেখি। তিনি সবুজ রঙের দুটো চাদর পরেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে আর এভাবে দেখিনি। এ কারণেই আমি হেসেছি। মুয়াযা হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে দেখেছিলেন এবং তিনি তাঁর থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। হাসান আল-বসরী, আবু কিলাবা এবং এয়াজিদ আররাকাশীর মত মহান উলামা, মুয়াযী থেকে হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন।'

এমন বহু মানুষ ছিলেন, যাঁরা কবর আযাব প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন—ফিরাউন ও তার লোকদের গন্তব্যস্থল দোযখের আগুনকে তাদের সামনে প্রত্যক্ষ সকাল এবং সন্ধ্যায় প্রদর্শন করা হয়" (সূরা মু'মিন, ৪৬ আয়াত)। আলবুখারী-ও আল মুসলিমের সহিহাইনে লিপিবদ্ধ একটা হাদীস ঘোষণা করে ঃ

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

لَوْ لَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا أَسْمَعُ ـ

অর্থাৎ, "যদি তোমরা গোপনীয়তা বজায় রাখো, তবে আমি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করতে পারি, যাতে তিনি তোমাদেরকে কবর আযাব সম্পর্কে শ্রবণ করান, যেমনিভাবে আমাকে তিনি শ্রবণ করিয়েছেন। কবর আযাব রূহ এবং শরীরের উপর আপতিত হয়, কারণ তারা উভয়ই এক সাথে কুফর ও গুনাহ সংঘটন করে। শুধুমাত্র রূহ্‌কে আযাব দেওয়া আল্লাহ্‌ তায়ালার ইলম ও বিচারের সঙ্গে খাপ খায় না। উলামাই কিরাম ঘোষণা করেন যে, যদিও শরীর কবরের মধ্যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মনুষ্য চক্ষুর অন্তরালে চলে যেতে পারে, তবুও সেটা আল্লাহ্‌র জ্ঞানের পরিসরে বিরাজ করে। বহু সাহাবী প্রত্যক্ষ করে বলেছেন যে, মৃতদের রূহ এবং দেহ উভয়কেই আযাব দেয়া হয়। ইবনুল কাইয়েম তাঁর কৃত 'কিতাবুর রূহ' ইমাম সুয়ূতী তাঁর প্রণীত 'শরহ্‌-আস্‌-সুদূর' এবং ইব্‌নে রাজাব তাঁর রচিত 'আহ্‌ওয়াল আল-কুবূর' গ্রন্থে লিখেছেন : হুযুর (সঃ)-এর উপস্থিতিতে এক ব্যক্তি বললো' আমি এক লোককে মাটি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। অপর এক লোক তাকে লাঠি দ্বারা আঘাত করার পর সে ভূতলে অদৃশ্য হয়ে যায়। আর এটার পুনরাবৃত্তি হতে লাগল যতবার ঐ লোকটা মাটি থেকে উঠে আসছিল"। নবীজী (দঃ) বললেন :

ذَاكَ أَبُو جَهْلٍ يُعَذَّبُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

অর্থাৎ, 'তুমি যাকে দেখেছ সে আবু জাহল্‌। পুনরুত্থান (দিবস) পর্যন্ত তাকে এভাবে আযাব দেওয়া হবে' (হাদীস) এ খবর এবং অনুরূপ খবর-সমূহ প্রমাণ করে যে, নবীগণও আউলিয়ার মত প্রত্যেকেই কবরের অভ্যন্তরে সংঘটিত ঘটনাবলী প্রত্যেক্ষ করতে পারেন। আউলিয়ার দর্শনক্ষমতাকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। তাঁরা আল্লাহ্‌র কুদরতে প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

আমরা এ পর্যন্ত যা লিখেছি তা প্রমাণ করে যে, মৃতজন কবরসমূহে আমাদের অজ্ঞাত একটা জীবনে বর্তমান রয়েছেন, যাকে আমরা 'কবর জীবন' নামে আখ্যা দিতে পারি। সমস্ত ইসলামী উলামা বলেন যে, অস্তিত্বের অবসান নয়, বরং এক ঘর থেকে অন্য আরেক ঘরে স্থানান্তর। নবীগণ এবং আউলিয়া ইসলামী বিশ্বাসকে প্রচার-প্রসারের কাজে আত্মউৎসর্গিত করেছিলেন, আর তাই তাঁরা (ইন্তেকালের পর) শহীদের মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। কুরআন করীমে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে যে শহীদগণ জীবিতাবস্থায় রয়েছেন। তা হলে তাঁদের মাধ্যমে তাসাব্বুর ও তাশাক্কু এবং তাওয়াসসুল করাটা কেন বিস্ময় উদ্রেককর হবে? 'তাসাব্বুবের' অর্থ নবী-ওয়ালীদেরকে আল্লাহ্‌র হুযুরে (উপস্থিতিতে) কারণ (cause) স্বরূপ সাহায্য করার জন্য আবেদন জানানো। 'তাওয়াস্‌সুলের' অর্থ, তাঁদেরকে আমাদের জন্য দোয়া করার অনুরোধ জানানো, যেহেতু তাঁরা ইহকাল এবং পরকাল উভয় জাহানেই আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা। কুরআন মজীদ ঘোষণা করে যে, তাঁরা যা চান তাই অর্জন করতে পারেন এবং তাঁদেরকে তা মঞ্জুর করা হয় (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে)। জীবিত লোকদের কাছ থেকে যা চাওয়া যায় তা যদি আল্লাহ্‌র ঐ সব ওফাতপ্রাপ্ত প্রিয় বান্দাদের কাছে চাওয়া হয়, তা হলে কি প্রার্থনাকারী ব্যক্তিটিকে দোষারোপ করা উচিত হবে? সেই ব্যক্তিকে কি তিরস্কার করা উচিত হবে, যিনি ওফাতপ্রাপ্ত নবী-ওয়ালীগণকে ওয়াসিলা

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

করেন একথা মনের মধ্যে পোষণ করে যে, আল্লাহ্ স্বয়ং প্রার্থিত বস্তু, যা নবী-ওয়ালীদের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে তা সৃষ্টি করে দেবেন এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। যারা ধারণা করে যে, নবী-ওয়ালীগণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মাটি হয়ে গিয়েছেন এবং অস্তিত্ববিহীন হয়েছেন, তারাই এগুলোকে অস্বীকার করে। যারা ইসলাম ও শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ এবং যারা এগুলোর মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞানহীন তারাই অবিশ্বাস করে। দীনী পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, যারা নবী-ওয়ালীগণের মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে না, তারা দীন সম্পর্কে কর্তৃত্বসম্পন্ন নয়, বরং দীন সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। শরীয়তকে তারা বুঝতে পারেনি। যে সকল মুসলিমকে তারা অজ্ঞ মনে করে, বস্তুতঃ পক্ষে তাঁরাই অধিক ব্যুৎপত্তি এবং বুদ্ধিসম্পন্ন হাদীসসমূহে বিবৃত এবং মুসলিম উলামার সর্ব-সম্মত রিওয়ায়াতানুযায়ী ব্যক্ত হয়েছে যে, নবী-ওয়ালীগণের কবরসমূহে গমন করে তাঁদের মধ্যস্থতায় আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করা এবং রোজ হাশরের দিনে তাঁদের কাছ থেকে শাফাআত বা সুপারিশ পাওয়ার আশায় প্রার্থনা করা জায়েয (অনুমতিপ্রাপ্ত)। এ কথাও বোঝা উচিত যে, যারা এসব নির্ভরযোগ্য দলিল অবিশ্বাস করে মুসলিম-দেরকে তাঁদের বিশ্বাসের জন্য দোষারোপ করে, তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে বিকৃত ও বিধ্বংস করার কুনিয়ত পোষণ করে। আমাদের হামদ ও শুকরিয়া প্রকাশ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যাতের প্রতি, যিনি মনুষ্য জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর হাদীস এবং নবীজী (সঃ)-এর অনুসারী প্রিয় ও মনোনীত সালেহীনের বইসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার নিয়ামত আমাদের উপর বর্ষণ করেছেন। যদি আমাদের আল্লাহ্ পাক এ নিয়ামত মঞ্জুর না করতেন, তাহলে আমরা নিজ সামর্থ্যে ওগুলো খুঁজে বের করতে পারতাম না এবং বুঝতেও পারতাম না। ফলস্বরূপ আমরা বিলুপ্ত হয়ে যেতাম।

এখন আমরা সেইসব আয়াত পেশ করব, যেগুলোতে প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করার সময় নবী-ওয়ালীদেরকে মধ্যস্থতাকারীস্বরূপ স্থাপন করা জায়েয, যাতে তাঁরা আল্লাহ্র সৃষ্টি প্রক্রিয়ার কারণ হিসেবে কাজ করতে পারেন। আয়াত —'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে (তাকওয়া) কর। তাঁর সান্নিধ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ওয়াসিলারে খোঁজ কর (সূরা মায়িদা, ৩৮ আয়াত)। আয়াত—

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ
رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ ......

অর্থাৎ 'এমন অনেক লোক আছে' যারা ইবাদত ও দোয়া করে। তারা একটা ওয়াসিলা, একটা বাহনের তালাশ করে চলে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে তারা চায় যেন বাহনটি তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয় (সূরা ইসরা, ৫৭ আয়াত)। আয়াতগুলোতে আল্লাহ মুসলিমদেরকে আদেশ করছেন, যেন তাঁর কারণ এবং মাধ্যমসমূহকে আঁকড়ে ধরেন, যাতে তাঁরা আল্লাহ্রই ঘোষণানুযায়ী তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে পারেন। মাধ্যমসমূহকে নির্দিষ্ট কোন বস্তু বলে ঘোষণা করা হয়নি। অতএব, যা কিছু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে সাহায্য করে তার সবই ওয়াসিলা বিশেষ। অর্থাৎ খারেজীদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে শুধুমাত্র (মৃতজনের) দোয়াই নয়, তাঁদের শাফাআত এবং আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তাঁদের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য এবং তাঁরা নিজেরাও ওয়াসিলা। আর আহল্-ই সুন্নাতের

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

উলামা-ই কিরাম বলেন যে, নবীগণের এবং তাঁদের অনুসারীগণের শাফাত মর্যাদা, কারামত ও দোয়া ইত্যাদি তাঁদের পথ বা তাঁদের মালিকানাধীন ঈমান, ইবাদত ও ইখলাসের মতই ওয়াসিলা বা মাধ্যম। ওয়াহাবীরা বলে যে, তারা ওয়াসিলা নন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে কুরআন-হাদীস, নবী এবং ওয়ালীগণের কুৎসা রটনায় লিপ্ত। কুরআন এবং হাদীসে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে যে, নবী এবং ওয়ালীগণকে ওয়াসিলা বানানো যাবে।

সূরা আনফালের তেত্রিশ আয়াত ঘোষণা করে ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ -

অর্থাৎ 'আমি সেই সব কাফিরের শাস্তি দিব না ততক্ষণ, যতক্ষণ আপনি [নবীজী-(সঃ)] তাদের মাঝে অবস্থান করবেন।" (আয়াত)। আল-বুখারী ও তাফসীর কিতাব সমূহে লিপিবদ্ধ ভাষ্যানুযায়ী কাফিররা হুযুর (সঃ)-কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বলত ঃ "তোমার আল্লাহ্‌কে বলো যেন সে আমাদের উপর আযাব দেয়।" উপরোক্ত আয়াতটি এর ফলে নাযিল হয় এই ঘোষণা নিয়ে যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর পাক শরীর মুবারক কাফিরদের মাঝে অবস্থিত হওয়ার দরুন আযাব নিপতিত হচ্ছে না। এ কথা বলা যাবে না যে, হুযুর পুর নূর (সঃ) তার নবুয়তের ওয়াস্তে কিংবা তার দোয়া ও শাফাআত দ্বারা আযাব প্রেরণ বন্ধ করেছিলেন কারণ কাফিরদের জন্য কোন দোয়া অথবা শাফাআত করা হবে না, আর নবুয়ত, যার উপর তারা বিশ্বাস আনে নি, সেটাও তাদের কোন মঙ্গল আনবে না।

আল্লাহ্ পাক একই আয়াতে ঘোষণা করেন ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেন না, যেহেতু তারা ক্ষমা চায়" (আয়াত ৩৩, সূরা আনফাল)। সালাম আস, সালেহীনের অধিকাংশই বলেন যে, এ আয়াতটির অর্থ আমি তাদেরকে শাস্তি দিই না কারণ তাদের সন্তান-সন্ততি হবে যারা ক্ষমা চাবে। আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন; আমি তাদেরকে শাস্তি দিই না কারণ তিনি অনন্তকালে ডিক্রী করেছিলেন যে, কাফিরদের উত্তরসূরিদেরকে ঈমানদার বানাবেন। সুতরাং যে সকল উলামা উপরোক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাঁদের মতানুযায়ী কাফিরদের রক্তে আগত মুসলিমগণ হচ্ছেন ওয়াসিলা যা আযাবকে রহিত করেছিল।

আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ ফরমান ঃ মানব জাতিকে যদি আমি একে অপরের বিরুদ্ধে ছেড়ে দিই, তা হলে পৃথিবী ওলট পালট হয়ে যাবে (সূরা বাকারা, ২৫১ আয়াত এবং সূরা হুজ্জ, ৪০ আয়াত)। কিছু তফসীরকার উলামা এ আয়াতটিকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ পৃথিবীটি সম্পূর্ণভাবে বিশৃঙ্খল হয়ে যেত যদি আল্লাহ্ কোন মুমিন সৃষ্টি না করে শুধু কাফির সৃষ্টি করতেন। বিশ্বাসীদের শরীরের অস্তিত্বই পৃথিবীকে বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করছে।' মানবের নিজের সত্তার মধ্যেই পরিত্রাণ নিহিত, যা তার আমলের ফলাফল থেকে অর্জন করা সম্ভব নয়। এ কারণেই একটা হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلسَّعِيْدُ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ وَالشَّقِىُّ فِىْ بَطْنِ اُمِّهٖ -

অর্থাৎ 'পৃথিবীতে আগমনের পূর্বেই একজন ব্যক্তি হয় সাঈদ (নেককার) নয়ত শাকী (বদকার)" (হাদীস) বাহ্যিকভাবে নেক আমলহতে 'সাঈদ হওয়ার

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

অবস্থা নিঃসৃত হলেও বাস্তবিকভাবে তা সত্য নয়। এ কারণেই একটা হাদীস ইরশাদ ফরমান ঃ

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا۔

অর্থাৎ 'একজন ব্যক্তি বদ কাজ করে, যা তাকে জাহান্নামে নেবে; সে জাহান্নামের নিকটবর্তী হয়। যদি সে উম্মুল কিতাবে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জ্ঞানে সাঈদ হয় তা হলে সে এমন কোন কাজ করে তার শেষ দিনগুলোতে যা তাকে বেহেশতে দাখিল করে দেয়; ফলস্বরূপ সে জান্নাতে গমন করে' (আল-হাদীস)। মানুষের আমল তাকে জান্নাতে নেয় না বরং তা তাকে বেহেশতে নিবার কারণস্বরূপ কাজ করে। আর এ কারণেই হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেন ঃ

لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلٍ قَالُوا حَتَّى أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ حَتَّى أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحْمَتِهِ۔

অর্থাৎ, 'কোন ব্যক্তিই তাঁর ইবাদত ও নেক আমলের জন্য বেহেশতী হবে না। যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, "আপনার জন্যও কি একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে?" তখন তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমার জন্যও তাই প্রযোজ্য হবে। আমি একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার দয়া ও রহমতের মাধ্যমে মুক্তি অর্জন করব" (আল-হাদীস)। কেউ বলতে পারবে না যে একজন ব্যক্তি তার ইবাদত ও নেক আমলের জন্য বেহেশতী হবে। কিন্তু মানুষ তাঁকেই নিশ্চিতভাবে বেহেশতী বলতে পারে, যিনি অনন্তকালে 'সাঈদ' হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন। কিংবা শাকী হওয়াটা ব্যক্তির আমলের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং তাঁর নিজের সত্তার (যাত) উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ হযরত রসূল-ই করীম (সঃ)-কে অন্যান্য মানুষের মাঝ থেকে বেছে নিয়েছেন এবং তাঁকে অন্যান্য নবীর চেয়ে অধিক মর্যাদাবান বানিয়েছেন একমাত্র হুযূর (সঃ)-এর পাক সত্তার জন্যই। প্রত্যেক মু'মিনই এটাও ব্যক্ত করেন, রসূল-নবী (আঃ)-এর ওয়ালী-গণের মাহাত্ম্যের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার, মর্যাদা এবং প্রত্যেকটা মাহাত্ম্যই ব্যক্তির যাতের উপর নির্ভরশীল, সেটা কিন্তু আবার উচ্চ মর্যাদার উপর নির্ভরশীল নয় (উদাহরণস্বরূপ প্রেসিডেন্ট হওয়ার কারণে ব্যক্তি মূল্যবান হয় না, বরং যেহেতু সে প্রেসিডেন্ট হয়েছে)। তাহলে এটা নিশ্চিত যে, ওয়াহাবীদের দাবী-পদার্থ বস্তু অথবা মানুষ (যাত বা সত্য)। কারণ হতে পারে না—নিছক ভ্রান্তি। আয়াত ও হাদীসসমূহ এবং হুযূর পাক (সঃ) এর সুন্নাত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, তারা একটা বিভ্রান্তিকর ও গোমরা পথের উপর বিচরণ করছে।

একটা হাদীসে ঘোষিত হয়েছে ঃ

أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ قَالَ بِتُرْبَةِ أَرْضِنَا وَرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى بِإِذْنِ رَبِّنَا مَرِيضُنَا۔

অর্থাৎ, "আমাদের অসুস্থ লোকেরা আমাদের মাটির নিয়ামত ও আমাদেরই একজনের লালার

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

মাধ্যমে এবং আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে সুস্থ হয়ে উঠে" (হাদীস)। যদি কেউ পরিষ্কার মাটির সঙ্গে স্বীয় পরিষ্কার লালা মিশ্রিত করে কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে ওষুধ স্বরূপ প্রদান করে, তাহলে আল্লাহ্ও অসুস্থ ব্যক্তিটিকে সুস্থতা দান করেন। মাটি এবং লালা কিংবা একজন ওষুধ প্রস্তুতকারীর বিশেষ প্রভাব যুক্ত ঔষুধসমূহের সবই হচ্ছে পদার্থ, বস্তু। অর্থাৎ, সেগুলো 'যাত'। সেগুলোর মর্যাদা রয়েছে কিংবা সেগুলো শাফাআত করতে পারে এ কথা ধারণা করা যায় না। সহীহ্ মুস্‌লিম শরীফে ঃ একটা সহীহ্ হাদীস ঘোষণা করে ঃ

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ ثَمَنْ شَرِبَ مِنْ
مَاءِ زَمْزَمَ لِأَيِّ نِيَّةٍ اَرَادَهَا مِنْ خَيْرِ دُنْيَا
اَوْ اٰخِرَةٍ حَصَلَ لَهُ مَقْصُوْدُهُ ـ

অর্থাৎ, "যমযম (কূপের) পানি পানকারী নিয়তানুযায়ী সেটার উপকারিতা রয়েছে" (আল হাদীস)। যখন যমযমের পানি বৈষয়িক কিংবা অপার্থিব কোন উপকার পাওয়ার নিয়তে পান করা হয়, তখন সেটা সেই উপকার প্রদান করে। বহু ঘটনা এ বিষয়টিকে প্রমাণ করে। সবাই জানেন যে, যমযমের পানি একটা যাত মাত্র, একটা পদার্থ মাত্র, সেটা নিজের উচ্চ মর্যাদার কারণে কর্ম সংঘটন করতে পারে কিংবা দোয়া ও শাফাআতের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য দিতে এবং সাহায্য করতে পারে বলে ধারণাই করা যায় না।

কাবা শরীফের দরজা এবং হাজর আল-আসওয়াদ পাথরের মধ্যবর্তী যিয়ারতের স্থানটাকে 'মুলতাযাম' বলা হয়, যা একটা সহীহ্ হাদীস শরীফে ।।৯।।৮ করা হয়েছে এবং যা ফকীহ উলামা কর্তৃক সর্ব সম্মতভাবে রিওয়ায়াত করা হয়েছে। যদি কেউ এই স্থানটাকে কা'বা শরীফের দেওয়ালের সঙ্গে স্বীয় পেটকে স্পর্শ করিয়ে মুলতাযামকে তার দোয়া কবুলের মাধ্যম বানিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা জানায়, তা হলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষতি ও ত্রুটি থেকে রক্ষা করেন। এটা বহুবার পরিদৃষ্ট হয়েছে। প্রত্যেকেই জানেন যে, মুলতাযাম হচ্ছে কাবা শরীফের দেওয়ালের মধ্যে অবস্থিত কিছু পাথরের সমষ্টি। এ সব পাথর হচ্ছে যাত অর্থাৎ পদার্থ। আল্লাহ্ যেমনিভাবে প্রত্যেকটা পদার্থের মধ্যে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে তিনি ঐ পাথর-গুলোকে (মুলতাযাম) উপকার ও শুভ ফল আনার মাধ্যম হিসেবে কাজ করার গুণ প্রদান করেছেন।

ঐ ধরনের গুণ ও প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা কাবা শরীফের উত্তরাংশে অবস্থিত ঝরনার নিচের যিয়ারতের স্থান, যেটাকে মাকাম আল-ইবরাহীম বলা হয় এবং যেটা মস্‌জিদুল হারামে অবস্থিত কাবাগৃহের দরজার বিপরীত দিকে অবস্থিত, সেটাকেও দেওয়া হয়েছে; আরো দেওয়া হয়েছে কাবা শরীফের এক কোণায় অবস্থিত হাজর আল-আস্‌ওয়াদ নামক কাল পাথরকে, যাকে চুম্বন ও হাত-মুখ দিয়ে মসেহ করলে সেই সব গুণের প্রভাব পাওয়া যায়। আল্লাহ্ ওগুলোর ওয়াসিলায় দোয়া প্রার্থীদের দোয়া কবুল হওয়ার গুণ ওগুলোকে প্রদান করেছেন। যখন এটা পরিদৃষ্ট ও বিশ্বাস হচ্ছে যে, ঐ সব পদার্থ দোয়া কবুলের মাধ্যমস্বরূপ কাজ করতে সক্ষম, তখন এ কথা কিভাবে ধারণা করা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর অনুসারী আল্লাহ্ পাকের প্রিয় বান্দাদের মধ্যস্থতায় প্রেরিত দোয়া কবুল করা হবে না? যদি কেউ এ কথা বলার দুঃসাহস দেখায় যে মাটি, মানুষের লালা, যমযমের পানি, মুলতাযাম, মাকাম-আল ইবরাহীমের পাথরগুলো—যেখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

পবিত্র পদচিহ্ন আছে এবং হাজর আল-আসওয়াদের ওয়াসিলায় উপকার পাওয়াটা নবী-ওয়ালীগণের পাক রওযাগুলোকে ওয়াসিলা বানাবার বিষয়টা প্রমাণ করে না, তবে তাঁর কথা প্রমাণ করবে যে, সে দীনের জ্ঞানে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং সে আল্লাহ্ ও রসূল (সঃ) এবং মুস্লিমদেরকে শরমায় না। কারণ, সাহাবা-ই কিরাম, হুযুর পুর নূর (সঃ)-এর মহা সম্মানিত সত্তাকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন।

আল-বুখারী এবং অন্যান্যদের রিওয়ায়াতকৃত উরউয়া ইবনে মাস্উদ আস্ সাকাফীর কথা সর্বজনবিদিত 'আমি হুদায়বিয়ার সন্ধিতে কাফিরদের প্রতিনিধি হিসেবে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে গমন করি। পরবর্তী পর্যায়ে আমি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে কুরাইশ নেতাদেরকে বলি ঃ তোমরা জানো যে আমি ইতিপূর্বে পারস্যরাজ কিসরা এবং বাই-জেনটীয় সম্রাট সিজার এবং আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি বহুবার। কিন্তু হযরত মুহাম্মদের সাহাবা-ই কিরাম কর্তৃক তাঁর প্রতি প্রদর্শিত ভক্তি-শ্রদ্ধা সম্রাটরা কেউই পায় নি (তাদের অনুসারীদের কাছ থেকে)। আমি তাঁর পবিত্র লালা (থুথু) মাটিতে পড়তে দেখিনি—তাঁর সাহাবাগণ সব সময় তা ধরে ফেলেছেন এবং নিজেদের মুখমণ্ডলে ও চোখে মসহ করেছেন। ওযুতে ব্যবহৃত পানি সাহাবাগণ ছুটে গিয়ে সংরক্ষণ করে থাকেন পরবর্তীকালে নিয়ামত আদায়ের উদ্দেশ্যে যখন তাঁর চুল বা দাড়ি মুবারক কাটা হয়, তখন তাঁরা তার কোন অংশকেই মাটিতে পড়তে দেন না এবং সেগুলো তাঁরা দামী মণি-মানিক্যের মত সংরক্ষণ করেন। হযরত মুহাম্মদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা এবং নিজেদের বিনয়ের জন্য সাহাবাগণ, তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেন না। এ খবর থেকে বোঝা যায় সাহাবাগণ হুযুর (সঃ)-এর পবিত্র যাত হতে নিঃসৃত ছোট খাটো কণাকে কি রকম শ্রদ্ধা করতেন! এমন কি অন্যান্য লোকের কাছে যে সব বস্তু নোংরা ও বিশ্রী হিসেবে বিবেচিত, সেগুলোকেও তাঁরা ভক্তি করতেন। তাহলে একথা কি বলা যাবে যে, হুযুর (সঃ)-এর পবিত্র লালা এবং তাঁর পবিত্র দেহ মুবারক স্পৃষ্ট উযুর পানি, দোয়া বা সুপারিশ করার ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ার কারণেই ঐ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে অথবা, তাদের উচ্চ মর্যাদা ও মূল্যের কারণেই তা করা হয়েছে? সেগুলোর সবই তো পদার্থ। কিন্তু সেগুলো মহা মূল্যবান হয়েছে সবচাইতে সম্মানিত যাত অর্থাৎ তাঁর দেহ মুবারক হতে নিঃসৃত হওয়ার কারণেই। দেখুন ওয়াহাবীরা তাদের চিন্তাধারায় কি রকম অন্ত আহ্মক যে, যদিও তারা নিজেদেরকে প্রকৃত দীনদার ও তওহীদ পন্থী (মুয়াহ্হিদ) বলে পরিচয় দেয়, তবুও তারা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-কে আল-লাত মূর্তির সমতুল্য মনে করে। নবীজী (সঃ) ও তাঁর সাহাবা-ই কিরাম যে সব কাজ করেছেন এবং আমাদেরকে আদেশ করেছেন করতে; সেগুলোকে ওয়াহাবীরা মূর্তি পূজার সঙ্গে তুলনা দেয়। আমরা আল্লাহ্র কাছে তাদের কথা ও বিশ্বাস হতে আশ্রয় চাই, আমিন!

এমন বহু হাদীস আছে যেগুলো প্রতীয়মান করে যে, আল্লাহ্র কাছে কোন দোয়া কবুল করানোর উদ্দেশ্যে তাঁরই প্রিয় ও মনোনীত নবীগণ এবং তাঁদের অনুসারী ওয়ালীগণকে ওয়াসিলা বা মাধ্যম বানিয়ে নেয়া জায়েয। আর এ সব হাদীসের কোন উত্তরই আমাদের মতাদর্শের শত্রুরা দিতে পারে নি। তারা সম্পূর্ণ বেসামাল অবস্থায় পড়ে গিয়েছে! আল-বুখারী ও আল-মুস্লিম হাদীস গ্রন্থ দুটোতে লেখা আছে যে, আস্মা বিনতে আবু বকর তাঁর আশেপাশে সমবেত লোকদেরকে সবুজ

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

রেশমের জুব্বা প্রদর্শন করে বললেন, "হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সঙ্গে এ জুব্বাটা ছিল। আমি তাঁর ইন্তেকালের পর এটা নিয়েছি। আমরা আমাদের অসুস্থ লোকদেরকে এটা পরিধান করিয়ে সুস্থ করি। তাঁরা এটা পরিধান করে আরোগ্য লাভ করে। এতে প্রতিভাত হয় যে, সাহাবাগণ সেই জুব্বাটাকে সুস্থতা পুনরুদ্ধারের একটা ওয়াসিলা স্বরূপ ব্যবহার করতেন; কারণ আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী, যিনি সব মাহাত্ম্য ও পূর্ণতার অধিকারী তিনি তা পরিধান করতেন।

আল হামিদি তাঁর কিতাব, যেটা তিনি আল-বুখারী ও আল-মুসলিমের সহিহাইনের অবলম্বনে রচনা করেছেন, সেটাতে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাওয়াহিবের কথা উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেনঃ "আমার স্ত্রী আমাকে একটা পানিপূর্ণ পাত্র প্রদান করে আমাদের মা উম্মে সালামার কাছে প্রেরণ করল। হযরত উম্মে সালামা একটা রূপার বাক্স নিয়ে এলেন। ওর ভেতর রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর পাক দাড়ি মুবারক ছিল। তিনি পাত্রের পানিকে পবিত্র দাড়ির অংশগুলো দিয়ে নেড়ে সেগুলো বের করে নেন (পাত্র থেকে)। যে সব লোক বদ নযর কিংবা অন্য কোন বিপদ দ্বারা আক্রান্ত হতো, তারা পানি নিয়ে আসত এবং এটা করত এবং পানি পান করে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করত। আমি রৌপ্য বাক্সের ভেতর তাকিয়ে ভিতরে তাকিয়ে কিছু লাল বর্ণের চুল দেখতে পাই।"

একই পুস্তকে আল-হামিদি সাহল ইবনে সাদের কথা উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন—'রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাঁর পবিত্র জামাটি আমাকে উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। আমার মাতা আমার কাছ থেকে তা নিতে চাইলেন। তাঁকে আমি বললামঃ আমি এটা আমার কাফনের জন্য রাখতে চাই। তিনি বললেনঃ 'আমি আমাদের মনিব হযরত নবী-এ আকরাম (সঃ) এর জামা মুবারক থেকে তবাররুক (নিয়ামত গ্রহণ) নিতে চেয়েছিলাম।"।" অতএব এ কথা পরিস্ফুট যে সাহাবা ই-কিরাম নবী-ই-আকরাম (সঃ)-এর নিয়ামতপূর্ণ জামাকে শাস্তি হতে পরিত্রাণ পাবার জন্য মাধ্যম বা কারণ স্বরূপ ব্যবহার করেছিলেন।

আল-বুখারী ও আল-মুসলিমের সহিহাইনে লিপিবদ্ধ আছে যে উম্মে সালিম বলেন, "রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আমার কাছে ঘুমাচ্ছিলেন। তাঁর পাক মুখমণ্ডলে মুক্তার মত ঘাম জমছিল। আমি যখন সেগুলো অন্য আরেক জায়গায় সংগ্রহ করে রাখছিলাম, তখন তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, 'হে উম্মে সালিম। তুমি কি করছ? আমি বললাম; হে নবী! আমি আমাদের সন্তানদেরকে আপনার পবিত্র ঘাম দ্বারা তবাররুক গ্রহণ করাতে চাই। তিনি বললেন—'তুমি খুব ভাল কাজ করছ।' (আল-হাদীস)।"

ইবনে মালিক তাঁর' প্রণীত শরহে মাসাবিহ্‌ কিতাবে বলেন, "এই হাদীস পরিস্ফুট করে যে, তাসাউফের ইমামগণ, উলামা ও সুলাহা কর্তৃক ব্যবহৃত বস্তুর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টা অনুমতি প্রাপ্ত।

ইমাম মুসলিম লিখেছেনঃ "মদীনাবাসিগণ রসূল-ই পাক (সঃ)-এর কাছে পানিপূর্ণ পাত্রসমূহ নিয়ে যেতেন, যখনি তিনি ফজরের নামায পড়া শেষ করতেন। হুযূর (সঃ) প্রত্যেকটি পাত্রেই তাঁর হস্ত মুবারক চুবাতেন।" আর ইবনুল জাওযী তার 'বয়ানুল মুশকিল ইল হাদীস' গ্রন্থে লিখেছেন, "অতএব, মদীনাবাসিগণ নবীজী (সঃ)-এর মাধ্যমে নেয়ামত অর্জন করতেন (ঐভাবে), এটা ভাল হয়

---

১. ان النبى صلى الله عليه و سلم كان ينام عندها فكانت تأخذ من عرقه الشريف فاستيقظ فقال ما تصنعين يا ام سليم فقالت يا رسول الله نرجوا بركته لصبيانا لنا فقال اصبت -

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

যদি একজন আলিম তাঁর কাছে নিয়ামত অর্জনের উদ্দেশ্যে আগমনকারী ব্যক্তিদেরকে ফিরিয়ে না দেন।" ইবনুল জাওযীর এই মন্তব্য, ইমাম নববীর 'শরহে মুসলিম, গ্রন্থে উদ্ধৃত লেখনীসমূহ এবং শরহে মুসলিমে কাযী আয়াদের বক্তব্যসমূহ এবং হানাফী আলিম ইবনে মালিকের ভাষ্যসমূহ থেকে প্রতিভাত হয় যে, এ ধরনের দোয়া ও শাফাআত প্রার্থনা শুধু নবীজী (সঃ)-এর জন্য খাস নয়, যা খারেজীরা মনে করে থাকে।

আল-বুখারী ইবনে সিরিনকে উদ্ধৃত করেন: "রসুল- ই-পাক (দঃ) এর দাড়ি মুবারকের একটা চুল সংরক্ষণ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি আবু উবায়দাকে এ কথা জানালাম। তিনি বললেন, "পৃথিবীতে ঐ পবিত্র দাড়ির একটা চুল মুবারক পাওয়া থেকে অন্য কিছু পাওয়াকে আমি বড় মনে করি না।" আল বুখারী আরও লিখেছেন যে, দীর্ঘ কাল নবীজী (সঃ)-এর সুহবত লাভকারী আনাস বিন মালিক (রাঃ) ওসিয়ত করেছিলেন যে, দাফনের সময় যেন তাঁর সঙ্গে হুযুর (সঃ)-এর দাড়ির একটা চুল মুবারক কবরস্থ করা হয়। তিনি তা নিয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল ইযযতের হুযুরে উপস্থিত হতে চেয়েছিলেন। 'শিফা' কিতাবে লেখা হয়েছে, "হুযুর পাক (সঃ)-এর মাহাত্ম্য ও কারামত এবং নিয়ামত-গুলোর একটা এই যে, খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) নিজের সঙ্গে সব সময় হুযুর (সঃ)-এর দাড়ির একটা চল মুবারক বহন করতেন। ঐ চুলটি তিনি যে সব যুদ্ধে বহন করেছিলেন, তার সবই তিনি জিতেছিলেন।" যখন হযরত খালিদ তাঁর হাজত মকসুদ পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন হুযুর (সঃ)-এর দাড়ির একটা চুল মুবারক থেকে, তখন হুযুর পাক (সঃ) এর পবিত্র যাত মুবারকের মাধ্যমে বা মধ্যস্থতায় কেন আল্লাহ্ কর্তৃক হাজত মকসুদ পূরণ হবে না? আশেকে রসুল এবং মহান আলিম-ই-ইসলাম ইমাম বুসাইরী তাঁর 'কাসিদাতুল বুরদা' পুস্তকে এই সূক্ষ্ম বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন।

আল-বুখারী ও আল মুসলিম 'সহিহাইনে' হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন: "রসুল-ই-আকরাম (সঃ) দুটো কবরের পার্শ্বে উপস্থিত হন। তিনি বুঝতে পারেন যে, উভয়ই আযাবে নিপতিত অবস্থায় রয়েছে। তিনি একটা খেজুর গাছের ডাল তলব করেন। এর পর ডালটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে কবর দুটোর উপর পুঁতে দেন। হুযুর ইরশাদ ফরমান:

لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا .

অর্থাৎ "এগুলো যতদিন অশুষ্ক থাকবে, ততদিন তাদের (মৃত দুজনের) কষ্ট কম হবে" (আল হাদীস)। হাদীসটি শিক্ষা দেয় যে, আযাব প্রশমনের জন্য কবরের উপর খেজুর গাছের সবুজ ডাল রাখা যেতে পারে। সবুজ ঘাসের নিয়ামত স্বরূপ আল্লাহ্ পাক কবর আযাব প্রশমিত করে দেন। সবুজ ঘাস একটা যাত বা পদার্থ মাত্র। আযাবের ঐ ধরনের প্রশমন হুযুর পাক (সঃ)-এর জন্যই শুধু খাস (নির্দিষ্ট) নয়। এটা ইসলামী উলামার সর্বসম্মত ভাষ্য যে, কবরের উপর যে কোন সময় সবুজ খেজুর গাছের ডাল স্থাপন করা যেতে পারে। এ কারণেই মুসলিম কবরস্থানে সাইপ্রেস গাছ রোপণ করা হয়ে থাকে। যদি খেজুর গাছের ডালের মত একটা বস্তু কারণ স্বরূপ আযাব প্রশমন করতে পারে, তা হলে সাই-য়েদুল মুরসালিন [সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নবীজী-(সঃ)]কে কেন কারণ বা মাধ্যমস্বরূপ স্থাপন করা অনুমতি প্রাপ্ত হবে না? যদি কেউ জ্ঞানী ও যুক্তি-সঙ্গত চিন্তাধারা সম্পন্ন হয়, তা হলে কি সে এর প্রতি আপত্তি করতে পারবে?

আল্লাহ্ পাককে সন্তুষ্ট করার জন্য যাত বা বস্তুকে মাধ্যমস্বরূপ ধরা অনুমতিপ্রাপ্ত। আবু

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা হযরত হামযার পিত্তের একটা অংশ চিবিয়েছিলেন উহুদের জিহাদ সংঘটনকালে। নবী-ই আকরাম (সঃ) ইরশাদ ফরমান :

إِنَّ حَمْزَةَ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ أَنْ يُدْخِلَ جُزْءً مِنْ بَدَنِهِ النَّارَ -

অর্থাৎ, 'আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে হামযা অত্যন্ত মর্যাদা-সম্পন্ন এবং তিনি তাঁর দেহের কোন অংশকেই জাহান্নামে পোড়াবেন না" (হাদীস)। হুযুর পুর নূর (সঃ)-এর পবিত্র রক্ত মুবারক পান করার পর হুযুর (সঃ) মালিক ইবনে সিনানকে বলেন :

لَنْ تُصِيبَكَ النَّارُ -

অর্থাৎ, 'দোযখের আগুন তোমাকে পোড়াবে না' (হাদীস)। অনুরূপভাবে, হুযুর (সঃ)-এর শিঙ্গা অস্ত্রোপচারে পরিত্যক্ত রক্ত মুবারক পান করার পর তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়েরকে ভর্ৎসনা না করে বলেন :

وَيْلٌ لَكَ مِنَ النَّاسِ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِنْكَ

অর্থাৎ, "লোকদের মাধ্যমে তোমার বহু ক্ষতি সংঘটিত হবে; আবার তোমার মাধ্যমেও লোকদের বহু ক্ষতি হবে" (হাদীস)। একজন মেয়েলোক হুযুর (সঃ)-এর পান করা পানীয়ের অবশিষ্টাংশ পান করার পর তিনি তাকে বলেন :

فَقَالَ لَهَا لَنْ تَشْتَكِى وَجَعَ الْبَطْنِ أَبَدًا

অর্থাৎ, "তুমি আর কখনই পেটের ব্যথায় পীড়িত হবে না" (আল-হাদীস)। এই হাদীসটি সহীহ এবং মহিলাটির নাম 'বারাকা'। বহু উলামা, উদাহরণস্বরূপ, কাজী আয়ায তাঁর 'শিফা' শরীফে এবং ইমাম কাস্তালানী তাঁর 'আল-মাওয়াহিব আল লাদুনিয়া' গ্রন্থে এই রিওয়ায়াতটি লিখেছেন : হে মুসলিমগণ! রক্ত এবং অনুরূপ বস্তু, যা পূর্বে হুযুর (সঃ)-এর ছিল, তা যদি দোযখের আগুন হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য এবং রোগ-ব্যাধি প্রশমনের জন্য কারণস্বরূপ কাজ করতে পারে, তবে এ কথা কেন বিশ্বাস করা যাবে না যে তাঁর পবিত্র সত্তা (যাত) অনুরূপ সুবিধাদি অর্জনে মধ্যস্থতাকারী হতে পারেন? তাঁর পাক যাত আল্লাহ্‌র নূর ছিলেন। তাঁর ছায়া কখনো মাটিতে পড়েনি। জাবির এবং আরও অনেকে এ কথা বর্ণনা করেছেন। যদি কেউ বলে, "তাঁকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না; তিনি আল্লাহ্‌র সৃষ্টি প্রক্রিয়ার কারণ হতে পারেন না"—তাহলে সেই ব্যক্তিকে কি আল্লাহ্‌র প্রিয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী (সঃ)-এর উম্মতের একজন সদস্য হিসেবে গণ্য করা উচিত, নাকি শত্রু হিসেবে গণ্য করা উচিত? আয়াতসমূহে ঘোষিত হয়েছে যে, নবীজী (সঃ) রহমতস্বরূপ এমন কি কাফিরদের জন্যও! তাহলে কেন তিনি মুসলিম ও আহল্-এ সুন্নাত ওয়াল জামাত, যাঁরা তাঁকে ভালবাসেন, তাঁদের জন্য রহমতের কারণ বা মাধ্যম হবেন না?

"ওয়াসিলার তালাশ কর"—আয়াতটির 'ওয়াসিলা' এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ইবাদত, দোয়া এবং পাক ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন যাতসমূহ (ব্যক্তিত্ব, বস্তু)। আমাদের উদ্ধৃত হাদীস ও ঘটনাসমূহ এ সত্যটিকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে।

বহু আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সৃষ্টির কাছে সকল জিনিস প্রার্থনা করা জায়েয, এমন কি সে সব জিনিসও যেগুলো মানুষ দিতে পারে না—শুধুমাত্র আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর আউলিয়াকে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

কারামতস্বরূপ যা দান করেছেন তা দিয়েই তাঁরা তা দিতে এবং করতে পারেন। ঐ সব আয়াতের একটা হচ্ছে সূরা নমলের আয়াতটা যেখানে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর কথা উদ্ধৃত হয়েছে—

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي

بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۔

অর্থাৎ, "হে আমার জাতি! তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছ, যে আমার কাছে (রানী বিলকিসের) সিংহাসনটা নিয়ে আসতে পারবে?" তিনি যে সকল লোকের মাঝে ভাষণ দিচ্ছিলেন তাদের মধ্যে জিন, ইনসান সবাই ছিল। দুষ্ট জিন সম্প্রদায়ের নেতা ইফরিত বললোঃ "আপনার উঠে দাঁড়িয়ে সভা ত্যাগ করবার পূর্বেই আমি তা নিয়ে আসতে পারব।" সুলাইমান (আঃ) বললেন, "আমি আরও তাড়াতাড়ি আনতে চাই।" সুলাইমান (আঃ) এর উযীর আসফ বিন বারখিয়া বললেনঃ "আমি চোখের পলকে নিয়ে আসতে পারব" (আল আয়াত)। রানী বিলকিসের সিংহাসন ছিল ইয়েমেন দেশে, আর সুলাইমান (আঃ) ছিলেন দামেস্কে। উভয় স্থানের দূরত্ব ছিল পদব্রজে তিন মাসের যাত্রাপথ। আসফ মুহূর্তে মধ্যে মাটির নিচে দিয়ে সিংহাসনটি নিয়ে আসেন। সিংহাসনটি স্বর্ণ ও মণি-মানিক্য দ্বারা অলংকৃত ছিল। এই ঘটনা একটা কারামত। আল্লাহ তাঁর রীতি-নীতি বহির্ভূত উপায়ে তাঁর জন্মগত বান্দা আউলিয়া-এ কেরামকে কারামত মঞ্জুর করে থাকেন। কুরআন এ করীমে তিনি গর্বের সঙ্গে বর্ণনা করেন কারামতটির কথা, যেটা তিনি তাঁর একজন প্রিয় সালেহ বান্দা ও ওয়ালীর কাছে মঞ্জুর করেছিলেন। তিনি হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে এই কারামতটি কামনা করার জন্য ভর্ৎসনা করেন নি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন নি—"আমি তোমার হৃদযন্ত্রের নালির কাছে থাকা সত্ত্বেও কেন তুমি অন্য কারো কাছে চাইতে গেলে? মানুষ যা করতে পারে না এবং যা আমি ছাড়া আর কেউই করতে পারে না, তা তুমি কেন আমার কাছে চাইলে না?" এর কারণ হচ্ছে, হযরত সুলাইমান (আঃ) আল্লাহর নবী ছিলেন এবং তিনি জানতেন যে তাঁর এই কথা বা ইচ্ছা আর কিছুই নয়, শুধুমাত্র কারণসমূহকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া, যা তাঁর শরীয়তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। আল্লাহ্ মানুষদেরকে কারণসমূহকে আঁকড়ে ধরতে আদেশ দিয়েছেন। রাসূল এ পাক (দঃ), আউলিয়া, সুলাহা ও শহীদদেরকে আবেদন জানানোও অনুরূপ একটা ক্রিয়া। তাঁদের কাছে মঞ্জুরীকৃত আল্লাহর কারামতগুলোর সদ্ব্যবহারের এটা একটা উপায় মাত্র। তাঁরা হচ্ছেন কারণ (সাবাব), বাহন (ওয়াসিতী) এবং মাধ্যম (ওয়াসিলা)। একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টি করে থাকেন। আউলিয়ার কারামত হচ্ছে নবীগণের মুজিযা ও মাহাত্ম্য। নবীগণের মাধ্যমেই আউলিয়া কারামত অর্জন করেন, কারণ তাঁরা নবীগণকে অনুসরণ করেন।

সূরা বাকারার ৮৯ আয়াতটি* সেই আয়াতগুলোর একটি যেগুলোতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের, প্রথমতঃ নবীকুল শ্রেষ্ঠ হুযুর (দঃ)-এর

ক্রমশঃ

---

* وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَٰبٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ
كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَٰفِرِينَ ۔

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ওয়াহাবী মতবাদ খণ্ডনে ঐশী অবদান

গাযী সালাহ্ উদ্দীন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শরণাপন্ন হয়ে শাফায়াত প্রার্থনা জায়েয। হাদীস বেত্তাগণ সর্বসম্মতভাবে রেওয়ায়াত করেন যে, এই আয়াতটি খাইবারের ইহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এ সকল ইহুদীরা জাহেলীয়া যুগে 'আসাদ' এবং 'গাতফান' গোত্র দু'টোর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। যুদ্ধ চলাকালীন তারা দোয়া করেঃ "হে আমাদের আল্লাহ্! আমাদেরকে সাহায্য করুন সেই নবীর ওয়াসীলায়, যাঁকে আপনি সবশেষে প্রেরণ করবেন।" শেষ নবী (দঃ)-এর শরণাপন্ন হয়ে ইহুদীরা বহু যুদ্ধ জয় করে। কিন্তু যখন রাসূলে এ করীম (দঃ) এসে ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন, তখন তারা তাঁকে হিংসা শুরু করে এবং তাঁর উপর ঈমান আনে না। ইবনুল কাইয়েম আল জাওযিয়া তাঁর 'বাদায়ী আল কাওয়াইদ', গ্রন্থে বলে, "জাহেলীয়া যুগে ইহুদীরা তাদের প্রতিবেশী আরবদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর পাক সত্তার ওয়াসীলায় আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য কামনা করে হুযুর (দঃ)-এর আবির্ভাবের বহু পূর্বে। আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করেন এবং তারা জয়ী হয়। কিন্তু হুযুর পুর নূর (দঃ) ইসলাম প্রচার শুরু করার পর তারা তাঁকে অবিশ্বাস করে। ফলস্বরূপ তারা কাফের হয়ে যায়। যদি তারা তাঁকে পূর্বকালে বিশ্বাস না করত, তাহলে তো আর তারা তাঁর মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থী হতো না।" তফসীর কিতাব আল বায়দাবীর কয়েকটি শরহ্-এ সাদ-উদ্-দীন তাফতাযানীকে উদ্ধৃত করা হয়েছে; তিনি বলেন—"ইহুদীরা নবী করীম (দঃ) এর পবিত্র নাম মুবারক উল্লেখ করে সাহায্য কামনা করেছিল। তারা নিজেদের জন্য হুযুর (দঃ) এর পবিত্র নাম শাফায়াত কারী বানিয়েছিল।" 'মাওলিদুন নবী' গ্রন্থে আল্লামা তাকিউদ্দীন হুসনী লিখেছেনঃ "একজন মুসলিম তাঁর প্রত্যেকটি কাজে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কে মধ্যস্থকারী বানান, যখন তিনি জানতে পারেন হুযুর (দঃ) এর উচ্চ নৈতিক গুণাবলী, দয়া, ধৈর্য ও সরলতা সম্পর্কে; ফলস্বরূপ তিনি উপলব্ধি করতে পারেন আল্লাহ্‌র কাছে হুযুর পুর নূর (দঃ) এর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে। যেহেতু রাসূলে এ মকবুল (দঃ) হচ্ছেন শাফায়াতকারী, সেহেতু আল্লাহ্ তাঁর শাফায়াত প্রত্যাখ্যান করেন না। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্‌র মাহবুব (প্রিয়)। আল্লাহ্ পাক, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এর মধ্যস্থতায় প্রেরিত প্রার্থনার জবাব দেন। মহান আল্লাহ্ তায়ালা এ কথা কুরআনে ঘোষণা করেছেন এবং তা আওলিয়ার কাছে উম্মোচিত করেছেন। কুরআন মজীদ ফরমান যে, সকল মুসলিম, এমন কি নবীজী (দঃ) এর শত্রুরাও তাদের হাজত-মকসুদ পূরণ করেছে হুযুর (দঃ)-কে ওয়াসীলা বানিয়ে। আল্লাহ্ এরশাদ করেন যে, তিনি তাদেরকে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে দিয়েছেন, কারণ তিনি হুযুর (দঃ)-কে অত্যন্ত ভালবাসেন এবং তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে সৃজন করেছেন বলে (তাঁর ওয়াস্তে প্রেরিত দোয়া আল্লাহ্ প্রত্যাখ্যান করেন নি)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস্ (রাঃ) বলেনঃ জাহেলীয়া যুগে খাইবারের ইহুদীরা গাতফান গোত্র নামক আরবীয় কাফেরদের সঙ্গে সদা সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত হতো এবং পরাজিত হতো। এরপর তারা দোয়া করে—"হে আমাদের আল্লাহ্! আপনার (সর্বাধিক) প্রিয় এবং ওয়াদাকৃত সর্বশেষ নবী (দঃ) এর ওয়াস্তে আমাদেরকে আপনি সাহায্য

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

করুন। ফলস্বরূপ তারা গাতফান কাফেরদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়।" কিন্তু ইহুদীরা হুযুর পুর নুর (দঃ)-কে বিশ্বাস করে নি, যখন তিনি আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হন। তারা কাফের হয়ে যায়। আল্লাহ উপরোক্ত আয়াতে ঘটনাটি ব্যক্ত করেন। আমরা দেখেছি যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে নবীজী (দঃ) এতই উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন যে, আল্লাহ, এমন কি সেই সব কাফেরদের দোয়াও কবুল করে নিয়েছিলেন, যারা হুযুর (দঃ)-কে ওয়াসীলা বানিয়েছিল। যদিও আল্লাহ জানতেন যে, ইহুদীরাই তাঁর প্রিয় নবী (দঃ) এর সবচেয়ে মারাত্মক শত্রুতে পরিণত হবে এবং নবীজী (দঃ) এর ক্ষতি করতে প্রয়াস পাবে, তবুও তিনি তাদের দোয়া কবুল করে নেন, যখন তারা হুযুর (দঃ) কে ওয়াসীলা করে দোয়া প্রেরণ করেছিল। এ কথা যখন প্রতিভাত হলো যে, হুযুর (দঃ) এর উচ্চ মর্যাদা ও শাফায়াত, তাঁর পৃথিবীতে আগমনের পূর্বেই ঐ রকম উচ্চ পর্যায়ে ছিল, তখন এটা কি কোন জ্ঞানী এবং বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির দাবী করা উচিত হবে, যে, তাঁকে ওয়াসীলা ও শাফায়াতকারী বানানো গুনাহের কাজ হবে? হুযুর (দঃ) কে সব আলেমের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণের পরও কি এ দাবী করা যুক্তিসঙ্গত হবে? এক্ষণে বোঝা গেল যে, যারা এতে (শাফায়াতে) বিশ্বাস করে না, তারা ইহুদীদের চাইতেও জঘন্য এবং নিকৃষ্ট। প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) এর দোয়াও তখন কবুল করা হয়েছিল, যখন তিনি রাসূল এ করীম (দঃ)-কে ওয়াসীলা করেছিলেন। এ বিষয়টি তফসীর ও হাদীস কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। যাঁরা এ সকল দলিল অধ্যয়ন করে বুঝতে পারেন, তাঁরা সুস্পষ্টভাবে জানেন হুযুর পাক (দঃ) কে ওয়াসীলা বানানোর বৈধতায় অবিশ্বাসী লোকেরা কি ধরনের সত্যবিমুখ।

সম্পূরক ঃ নবী ও ওয়ালীগণের কারামত এবং উচ্চ মর্যাদার কারণেই আল্লাহ কর্তৃক আবেদনসমূহ মঞ্জুরীপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, যখন সেই সব আবেদন তাঁদের মধ্যস্থতায় এবং সুপারিশে প্রেরিত হয়। তাঁরা ওফাতের পরও কারামতসম্পন্ন হয়ে থাকেন। আহলে আস্ সুন্নাতের উলামা-এ কেরাম সর্বসম্মতভাবে রেওয়ায়াত করেন যে, কারামত সত্য এবং এতে ঈমান রাখা ওয়াজিব। আল্লাহ এরশাদ ফরমান যে, আউলিয়া কারামতসম্পন্ন। একটা আয়াতে বিবৃত হয়েছে যে, সুলাইমান (আঃ), রানী বিলকিসের সিংহাসনটা মুহূর্তে ইয়েমেনের সাবা হতে দামেস্কে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। এই সিংহাসনটা স্বর্ণ ও মণি-মাণিক্য দ্বারা অলংকৃত ছিল। আসাফ বিন বারখিয়া সেটা মুহূর্তের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। আনার সময় সিংহাসনটার কোন রকম ক্ষতি সাধিত হয় নি। আসাফ একজন ওয়ালী ছিলেন। সিংহাসনটা মুহূর্তে নিয়ে আসাটা তাঁর একটা কারামত। হযরত মরিয়মের কারামতও কুরআনের সূরা আল-ইমরানের ৩৭ নং আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। যদিও শুধুমাত্র যাকারিয়া নবী (আঃ) ই মরিয়মের হুজরাহ-এ গমন করতেন, তবুও তিনি যখনই সেখানে যেতেন, তখনই তাজা খেজুর দেখতেন। মরিয়ম বলতেন যে, সেগুলো আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হতো। আহলে-এ সুন্নাতের উলামা-এ কেরাম সর্বসম্মতভাবে ঘোষণা করেন যে, নবীগণের মুজিযার মতই আউলিয়ারও কারামত রয়েছে; কারণ আল্লাহ তাঁদেরকে ভালবাসেন যাঁরা নবীগণকে মান্য করেন এবং অনুসরণ করেন। তিনি তাঁদেরকে জীবনে ওফাতে কারামত দ্বারা ধন্য করেন। ওফাতের পরও নবী-ওয়ালীগণের মুজিযা ও কারামত বিরাজমান থাকার ব্যাপারটি প্রতীয়মান করে যে তাঁরা সত্য ছিলেন, যেহেতু তাঁদের জীবদ্দশায় প্রদর্শিত মুজিযা এবং কারামত প্রত্যক্ষকারী অবিশ্বাসী শত্রুরা মনে করেছিল যে, তারা সেগুলো অন্যদের কাছ থেকে শিক্ষা করে বুঝি প্রদর্শন করেছেন; কিন্তু তাঁদের ওফাতের পর সংঘটিত মুজিযা ও কারামত সম্পর্কে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

তা বলা বা ধারণা করা যায় না। আল্লাহ নিজেই মুজিযা ও কারামত সৃষ্টি করে থাকেন। এগুলো একমাত্র তাঁর ক্ষমতা থেকেই উদ্ভূত হয়। তিনি তাঁর নবী এবং ওয়ালীদের প্রতি দয়া ও নেয়ামতস্বরূপ এগুলো তাঁদের মাধ্যমে এবং তাঁদের শাফায়াতের মাধ্যমে সৃজন করে দেন। 'মুজিযা' একজন নবীর কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করা হয়; আর 'কারামত' একজন সালেহ ঈমানদারের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করা হয়, যিনি কোন একজন নবীর অনুসারী হিসেবে জ্ঞাত। নবীগণ সকলেই 'মাসুম' অর্থাৎ, তারা কখনই গুনাহ করেন না। শয়তান কোন নবীর সুরত বা চেহারা ধরে আসতে পারে না। আউলিয়া নবীগণের উত্তরাধিকারী এবং তাই শয়তান তাঁদের কাছে আগমন করতে পারে না। বহু কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে যে শয়তান, হযরত উমর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং আরও বহু সাহাবীদের কাছ থেকে পলায়ন করত। আলী উশি তাঁর প্রণীত 'বাদুল আমালী' নামক কাসিদার পুস্তকে বলেন : "ওয়ালীর কারামাত পৃথিবীতে বিরাজমান। তাঁরা হচ্ছেন দয়ার মানুষ।"

উপরোক্ত পংক্তির ব্যাপারে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের সংশয় থাকার কোন প্রশ্নই উঠে না। এটা ব্যক্ত করে যে, আউলিয়ার কারামত এই পৃথিবীতেই সংঘটিত হয়, কারণ আহল-এ সুন্নাত ওয়াল জামাতের সঙ্গে ঐ ব্যাপারে মুতাযিলাদের মতভেদ ছিল। মুতাযিলারা বলত যে, এ পৃথিবীতে কোন কারামত নেই। তারা মনে করেছিল যে, অলীর কারামতের সঙ্গে নবীর মুজিযা বুঝি তালগোল পাকিয়ে যাবে এবং ফলস্বরূপ নবীকে ওয়ালীর কাছ থেকে পৃথক করে চেনা যাবে না। আহল-এ সুন্নাতের মতে, মুজিযার অধিকারীকে ঘোষণা করতে হবে যে, তিনি একজন নবী; অপর পক্ষে কারামতের অধিকারীর জন্য নিজেকে ওয়ালী হিসেবে ঘোষণা করা নিষিদ্ধ। যদি সে ঐ ধরনের কথা বলে, তা হলে বুঝতে হবে সে ওয়ালী নয়। যদি ওহাবীরা এ বিষয়টি বুঝতে পারত, তা হলে তারা যিনদিক ও মিথ্যুকদের কথার ছুতা দেখিয়ে আউলিয়ার কুৎসা রটনা করত না। উপরোক্ত পংক্তি দুটোর অর্থ : "এক জন ওয়ালীর কারামত এ পৃথিবীতেও সংঘটিত হয়। আল্লাহ্ সেই সব লোকদের হাজত পূরণ করে দেন, যারা কোন ওয়ালীর কাছে কোন জিনিস চায় কিংবা তাঁর শাফায়াত চায়।" যাদের উপলব্ধি ক্ষমতা স্বল্প, তারা ঐ পংক্তি দুটো থেকে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, এক-জন ওয়ালীর কারামত শুধু এই পৃথিবীতে বিরাজমান; ওফাতের পর তাঁর আর কোন কারামত থাকে না। এই ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণভাবে ভুল, কারণ মহান উলামা—উদাহরণস্বরূপ হযরত হানাফী আল বুখারী তাঁর 'শরহে, কাসিদাতুল আমালী' গ্রন্থে এবং শাইখ আহমদ তাঁর শরহে আশবাহ পুস্তকে—হুবহু আমরা উপরে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছি, ঠিক সেভাবে এই পংক্তি দুটোর ব্যাখ্যা করেছেন। এটাও বলা যেতে পারে যে, পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সকল মানুষ এ পৃথিবীতেই রয়েছে (মৃত্যুর পরও)—অর্থাৎ পরবর্তী জগতে জীবন সূচনার আগ পর্যন্ত।

আউলিয়ার ওফাতের পরও অগণিত কারামত তাঁদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। উলামা-এ কেরাম এটা সর্বসম্মতভাবে রেওয়ায়াত করেছেন। আমরা এখন সেগুলোর কয়েকটি বর্ণনা করব। আল বুখারী লিখেছেন : হযরত আসিম—জনৈক সাহাবী আল্লাহ্র কাছে ওয়াদা করেন যে তিনি কোন মুস-রিককে স্পর্শ করবেন না এবং প্রতিদানে তাকেও যেন ক্যান মুশরিক স্পর্শ না করে। তাঁকে শহীদ করার পর কাফেররা তাঁর মরদেহের কাছে গমন করতে চায়। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আসিমকে রক্ষা করার জন্য এক ঝাঁক মৌমাছি প্রেরণ করেন। এত মৌমাছির আগমন ঘটে যে' কাফেররা আর তাঁর কাছে আসতেই পারেনি।.........কাফেররা সাহাবী হযরত হাবীবকে

(৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ওয়াহাবী মতবাদ খণ্ডনে ঐশী অবদান

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

কারারুদ্ধ করে। তারা তাঁকে হুমকি দেয়ঃ আমরা তোমাকে মুক্ত করে দেব যদি তুমি বল যে, মুহম্মদ (সঃ) একজন মিথ্যুক। যদি তুমি না বলো, তবে আমরা তোমাকে হত্যা করব। হযরত হাবীব উত্তর দেনঃ 'তাঁর পবিত্র কদম মুবারকও যাতে একটা কাঁটা দ্বারা ব্যথিত না হয়, এই জন্য আমি আমার প্রাণ কুরবান করতে প্রস্তুত আছি। কাফেররা তাকে শহীদ করে। কিছু সংখ্যক সাহাবী রাত্রে সেখানে গমন করে শহীদের গলা হতে ফাঁসীর দড়ি কেটে দেন। তিনি মাটিতে পড়ে যান। এর পর পরই তিনি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। হানযালা নামের জনৈক সাহাবী রাসুল-এ-করীম(দঃ) এর সঙ্গে 'গজওয়ায়' (জিহাদে) যাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি তৈরী হন। ফলে, তিনি গোসল না করে জিহাদে যান। তাঁকে শহীদ করা হয়। ফেরেশতারা তাঁকে গোসল দেন। তাই, তিনি 'গাসিল আল মালাইকা' নামে সুপ্রসিদ্ধ হন" (আল বুখারী)। মিশকাত কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আবিসিনীয় রাজা নাজ্জাসী ঈমানদার হয়ে যান। আমি বহু লোককে বলতে শুনেছি যে, সব সময় তাঁর কবরের উপর নূর জ্বল জ্বল করতে। রাসুল-এ-আকরাম (দঃ) জানান যে, হযরত আলী (কঃ)-এর ভ্রাতা জাফর, ফেরেশতাদের সঙ্গে ইয়েমেনের বিশা নগরীতে গমন করে সেখানকার অধিবাসীদের শুভ সংবাদ দেন যে, বৃষ্টি হবে। একজন কারী বা হাফিয হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর পাক মস্তক মুবারকের পাশে বসে সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করছিলেন। যখন 'আসহাবুল কাহাফ আমার আয়াত সমূহ দ্বারা আশ্চার্যান্বিত হয়েছিল'—আয়াতটা পাঠ করা হয়, তখন হযরত হুসাইনের পবিত্র মস্তক হতে একটা কণ্ঠস্বরকে বলতে শোনা যায় ঃ আসহাবুল কাহাফের ঘটনার চাইতেও আমাকে হত্যা এবং আমার দেহকে টানা হেঁছড়া করার ঘটনাটা আরও বিস্ময়কর! খলিফা মামুন, নাসর আল হাযাইকে ফাঁসী দেন। নাসরের মুখ যাতে কিবলার দিকে না ফিরতে পারে, তার জন্য বর্শায় সজ্জিত একজন সশস্ত্র পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়। রাত্রে তাঁর পবিত্র মুখ কিবলার দিকে ফিরে যায়। সেই মুহূর্তে তাঁর থেকে সূরা আনকাবুতের দ্বিতীয় আয়াতটা তেলাওয়াত হতে শোনা যায় ঃ

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا

মানুষ কি মনে করে যে, তারা 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই ছেড়ে দেয়া হবে। (আল আয়াত), একটা কবর থেকে সূরা মুলকের প্রারম্ভ হতে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত শোনা গিয়েছিল" (মিশকাত)। এ সব ঘটনার সবই সত্য; এ হাদীস গুলো উলামা রেওয়ায়াত করেছেন।

ইবনে আসাকির বলেছেন যে, উমাইর ইবনে হাবুবাব আস্ সালামী বলেন ঃ "উমাইয়াদের সময় আমরা আটজন বন্ধু বাইজেন্টাইনীয় গ্রীকদের দ্বারা কারারুদ্ধ হই। তারা আমাদেরকে তাদের সম্রাটের কাছে নিয়ে যায়। সে আদেশ দেয়—'শিরচ্ছেদ কর'। আমি আমার বন্ধুদের আগে নিজের জান দিতে অগ্রসর হই। পাদ্রীরা আমার প্রতি দয়াবান হয়। তারা আমার আচরণে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল। তারা সম্রাটকে আমার জন্য দয়া প্রদর্শনের আবেদন জানায় তাঁর হাত এবং পায়ে চুম্বন করে। একজন পাদ্রী আমাকে তার ঘরে নিয়ে যায়। সে একজন সুন্দরী রমনীকে নিয়ে এসে আমার কাছে পরিচয় দেয় ঃ 'এটা আমার কন্যা। আমি তোমাকে এর সাথে বিয়ে দিলাম; তুমি আমাদের

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

ধর্ম গ্রহণ কর। আমি বল্লাম ঃ 'আমি স্ত্রী অথবা সম্পত্তির জন্য আমার ধর্মকে বর্জন করতে পারব না।' কিছু দিন পর তার কন্যাটি আমাকে তাদের বাগানে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়। সে বলে—'তুমি কেন আমার পিতার উপদেশ অনুযায়ী চল না'? আমি পুনরায় উত্তর দিই ঃ 'আমি নারী কিংবা ধন-সম্পদের জন্য আমার দীনকে বিসর্জন দিতে পারব না। তখন সে জিজ্ঞাসা করে ঃ তুমি কি এখানে থাকতে চাও? নাকি তোমার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে চাও? আমি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা তার কাছে প্রকাশ করি। সে এরপর একটা তারকার দিকে আঙ্গুলী নির্দেশ করে বলে ঃ 'রাতে ঐ তারকার দিকে ধাবিত হবে, আর দিনে লুকিয়ে থাকবে। তুমি তোমার রাষ্ট্রে পেঁছে যাবে।' এ কথা বলেই সে ভেতরে চলে যায়। আমি তিন রাত হাঁটি। চতুর্থ দিন আমি যখন লুকিয়ে ছিলাম, তখন কিছু লোককে বলতে শুনি ঃ 'উমাইর, উমাইর'! আমি তাকিয়ে দেখি আমার শাহাদাৎ প্রাপ্ত বন্ধুরাই আমাকে ডাকছে। 'তোমরা কি শহীদ নও? আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি। তারা উত্তর দেয় ঃ 'হাঁ, আমরা শহীদ; কিন্তু এখন আল্লাহ্ শহীদদেরকে আদেশ দিয়েছেন উমাইর ইবনে আবদুল আযীযের জানাযা ও দাফনে শরীক হতে।' তারা সব্বাই ঘোড়ায় উপবিষ্ট ছিল। তাদের একজন বল্লো ঃ হে উমাইর! তোমার হাতটা দাও দেখি! আমি হাত এগিয়ে দিলাম। সে আমাকে এক টান দিয়ে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল। আমরা দ্রুত ছুটে চল্লাম। সহসা আমি নিজেকে স্বদেশ 'আল জাযিরায় আবিষ্কার করলাম।''

ইবনুল জাওযী লিখেছে ঃ ''আবু আলী আল বারবারী ছিলেন তথায় বসতি স্থাপনকারী প্রথম তিনজনের একজন। তিনি বাইজেন্টাইনীয়দের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর বন্ধুদের সাথে বন্দী হন। উমাইরের ঘটনার অনুরূপ ঘটে তাঁদের বেলায়ও। গ্রীকরা তাঁর বন্ধুদেরকে শহীদ করে। একজন পাদ্রী তাঁকে রক্ষা করে এবং তাঁকে তার গৃহে নিয়ে যায়। সে কন্যার মাধ্যমে তাকে ধোকা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ্ কন্যাটিকে হেদায়েত করেন (সত্য, সঠিক পথের দিকে)। তাঁরা দু'জনেই বেরিয়ে পড়েন। দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকেন উভয়েই। এরপর তাঁরা মানুষের পদ শব্দ শুনেন। আবু আলী বারবারী তাঁর দু'জন শহীদ বন্ধুকে দেখতে পান। তাঁদের সঙ্গে ফেরেশতাও ছিল। তিনি তাঁদেরকে সালাম জানিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করেন। তাঁরা উত্তর দেন ঃ 'আল্লাহ্ তোমাদের কাছে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। আমরা এ মহিলার সঙ্গে তোমার নিকাহ্ প্রত্যক্ষ করব'। তারা নিকাহ্ কাজ সমাপ্ত হবার পর প্রস্থান করেন। দম্পতিটি দামেস্কে গমন করে সেখানে দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। এ ঘটনাটি দামেস্কে সুপ্রসিদ্ধ হয়ে যায়'' (ইবনুল জাওযী)। ওফাতের পর জীবিত হয়ে প্রত্যাবর্তনকারী ব্যক্তিদের ঐ ধরনের ঘটনা এবং জীবনসমূহ লিপিবদ্ধ আছে ইবনে আবিদ দুনইয়ার কিতাবগুলোতে, আবু নুয়াইমের 'হিলইয়া' গ্রন্থে, ইবনুল জাওযীর 'সিফাতুস সাফওয়াদ' ও 'উয়ুন আল হিকায়াত' পুস্তকে এবং আরো বহু উলামার অসংখ্য কিতাবে। ইবনে তাইমিয়া এবং ইবনুল কাইয়েম আল জাওযিয়াও আউলিয়ার কারামত সম্পর্কে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছে।

এটা সত্যি বিস্ময়কর যে, কিছু হানাফী উলামা এবং ওহাবীরা বিশ্বাস করে না যে, আউলিয়া মুহূর্তের মধ্যে দূরবর্তী কোন জায়গায় গমন করতে পারেন (সায়ী আল মাকান), যা এক ধরনের কারামত বৈ কিছু নয়। এতে অবিশ্বাসীদের প্রতি হানাফী উলামা এ কেরাম তাঁদের ফিকাহ ও আকাইদের কিতাব গুলোতে অতি সুন্দর উত্তর প্রদান করেছেন। উদাহরন স্বরূপ, তাঁরা বলেছেন যে, যদি কোন পশ্চিম-দেশীয় ব্যক্তি কোন পূর্বদেশীয় রমনীকে বিবাহ করে

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

এবং তার স্ত্রীর কাছ থেকে দীর্ঘকাল দূরে থাকে, আর যদি কয়েক বছরের মধ্যে স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হয়, তাহলে আকাংক্ষিত সন্তানটি পিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে কারণ সেই ব্যক্তিটি তার স্ত্রীর কাছে 'সায়্যী আল মাকান' স্বরূপ গমন করতে পারে। ঐ ব্যক্তিটির সেই ধরনের করামত থাকার ব্যাপারটি অনুমতি প্রাপ্ত। এটা ফকীহ উলামা—এ কেরাম কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে ঘোষিত হয়েছে এবং আকাইদের কিতাব সমূহেও লিখা হয়েছে। 'ওয়াহবানিয়া' পুস্তকে লিখা হয়েছে, "সায়ী আল মাসাফা অথাৎ মুহূর্তের মধ্যে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়া আউলিয়ার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এর উপর ঈমান স্থাপন করা ওয়াজিব।" এই বিষয়টি 'আন নাসাফী; 'আল ফিকাহ্ আল আকবর,' 'আস্ সিওয়াদুল আযম,' 'ওয়াসিয়াতু আবি ইউসুফ, মাওয়াকিফ' ও 'মাকাসিদ' কিতাবগুলোতে এবং উক্ত কিতাবগুলোর শরাহ-এ লিপিবদ্ধ রয়েছে, আয়াতে সুস্পস্ট ভাবে ব্যক্ত হওয়ার পর কেন এতে বিশ্বাস করা হবে না? আহল-এ সুন্নাতের উলামা এ কেরাম ঐ আয়াতটার (সূরা নমল, ৩৮ আয়াত) উপর ভিত্তি করেই যুক্তির অবতারনা করেছেন। আয়াতে বিবৃত ঘটনাটা, যে ঘটনায় রানী বিলকিসের সিংহাসনকে মুহূর্তের মধ্যে দামেস্কে নিয়ে আসা হয়েছিল, সেই ঘটনাটা প্রতীয়মান করে যে, সায়ী আল মাসাফা একটা কারামত বৈ কিছু নয়।

ইমামুল আযম হযরত আবু হানিফার প্রনীত 'আস সিওয়াদুল আযম' পুস্তকের শরাহ এ আউলিয়ার কারামত সম্পর্কে অতি সুন্দর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। ঐ বইটি থেকে এবারত উদ্ধৃত করলাম ঃ

বত্রিশতম হচ্ছে আউলিয়ার কারামতে বিশ্বাস করার আবশ্যকীয়তা; তাঁদের কারামতে যে ব্যক্তি অবিশ্বাস করবে, সে বিদয়াতী, গোমরাহ্‌তে পরিণত হবে। আউলিয়ার কারামতের উপর তিন ধরনের বিশ্বাস রয়েছে। যদি ব্যক্তি কারামত বর্ণনাকারী আয়াতসমূহে অবিশ্বাস করে, তাহলে সে কাফেরে রূপান্তরিত হবে; যদি সে আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে, কিন্তু বলে যে, 'তাঁরা নবী ছিলেন', তাহলে পুনরায় সে কাফেরে পরিণত হবে; আর যদি সে আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে এবং এ কথা বলে না যে, 'তাঁরা নবী ছিলেন' তাহলে তার জন্য এ কথা বলা জায়েয হবে যে, আয়াতসমূহ আউলিয়ার কারামত সম্পর্কে বর্ণনা দেয়'। কারণ, আল্লাহ্ আয়াতটিতে ঘোষণা করেন যে, যেই ব্যক্তি রাণী বিলকিসের সিংহাসনটি মুহূর্তের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি একজন আলেম ছিলেন (কিতাবের এলম্ সম্পন্ন)। সেই আলেম হচ্ছেন আসাফ বিন বারখিয়া। তিনি একজন ওয়ালী ছিলেন, তিনি নবী ছিলেন না। সুলাইমান (আঃ)-এর উম্মতেরই একজন ছিলেন তিনি। যখন সুলাইমান (আঃ)-এর উম্মতের মধ্যে একজনের কারামত সম্পর্কে কুরআনে ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তখন এ কথা কেন বিশ্বাস করা হবে না যে, নবীজী (দঃ)-এর উম্মতগণ কারামত সম্পন্ন? নিশ্চয়ই নবীজী (দঃ), হযরত সুলাইমান (আঃ) হতে শ্রেষ্ঠ এবং নবীজী (দঃ)-এর উম্মত হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ! এখন যদি ওহাবী গোমরাহ্‌রা বলে ঃ 'কারামতটি হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর ছিল, তাহলে আমরা উত্তরে বলব ঃ এই উম্মতের কারামতসমূহ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (দঃ)-এর (অধিকারে)।' সূরা মরিয়মের ২৪ তম আয়াতে আল্লাহ্ ইরশাদ ফরমান ঃ

وَهُزِّيٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ـ

'অর্থাৎ খেজুর গাছকে তোমার দিকে টান দাও! তোমার জন্য সেখান থেকে তাজা খেজুর পড়বে' (আল আয়াত) আল্লাহ্ উন্মোচন করেন যে, তিনি হযরত মরিয়মের

http://khasmujaddedia.wordpress.com/

জন্য শুকনো খেজুর গাছ থেকে তাজা ফল উৎপন্ন করেছিলেন। হযরত মরিয়ম কোন নবী ছিলেন না। হযরত মরিয়মের পাশে যে সব ফল হযরত যাকারিয়া (আঃ) দেখেছিলেন এবং আসহাবুল কাহাফের ঘটনা ইত্যাদি সবই কারামত ছিল। এ সকল কারামতের অধিকারী ব্যক্তিগণ কেহই নবী ছিলেন না। পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতগণের মধ্যে যদি কারামত-সম্পন্ন আউলিয়া থাকতে পারে, তা হলে হযরত রাসুল এ করীম (দ) এর উম্মতগনের মধ্যে কেন কারামত-সম্পন্ন আউলিয়া থাকবেন না? সুরা আল-ই-ইমরানের ১১০নং আয়াতে ঘোষিত হয়েছে ঃ 'তোমরাই উম্মতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' (আয়াত) যদি কারামতে অবিশ্বাসীদের কেউ বলে ঃ 'কোন ব্যক্তি এক রাতের মধ্যে কাবা শরীফ গমন করে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না, তাহলে আমরা উত্তরে বলব ঃ 'রাসুল এ মকবুল (দ) কে সাত আসমানের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং আল্লাহ্ যেখানে নিতে চেয়েছিলেন সেখানে নিয়েছিলেন এবং মুহূর্তে ফেরত নিয়ে গিয়েছিলেন। এর থেকে বড় কি আর কোন কারামত হতে পারে? আমরা আরও বলব ঃ কে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন একজন মুমিন নাকি একজন কাফের? আমরা একজন কাফেরকে চিনি, যে নাকি পূর্ব থেকে পশ্চিমে, আবার পশ্চিম থেকে পূর্বে মুহূর্তে গমন করতে পারে এবং এতে আমরা বিশ্বাস ও করি। এই কাফের হচ্ছে ইব্লিস (শয়তান)। একজন কাফেরকে প্রদত্ত ক্ষমতা কেন আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদেরকে প্রদান করা হবে না? এ বিষয়ে প্রত্যেকের উচিৎ গভীরভাবে চিন্তা করা এবং ন্যায়পরায়ন হওয়া"। (আস সিওয়াদুল আযমের শরাহর উদ্ধৃতি এখানে শেষ হলো)

ইবনে তাইমিয়া এবং আরো অনেকে লিখেছেন যে, আউলিয়ার কারামতে যারা বিশ্বাস করে নি তারা ছিল খারেজী মুতাযিলা ও রাফেযী। অতএব এ সকল গোমরাহদের কাছে কারামত নেই। তাদের মধ্যে একজনেরও কারামত নেই। তাই তারা কোন কারামত দেখে না, কিংবা শোনেও না এবং এতে তারা ঈমানও রাখে না।

http://khasmujaddedia.wordpress.com/